পথ চলতে মনে রাখবেন—৩
রেলের কামরা পরিচ্ছন্ন রাখুন
কথনো কথনো
মধ্যে খাওয়া ছাড়া উপায়
না। কিন্তু খাওয়ার শেষে
দেখা যায় যে কামরার মেঝে
খোসা, খাবারের টুকরো,
কাগজ ইত্যাদি নানা জিনিষে
হয়ে আছে। কামরায়
হলে খান; কিন্তু
ডেকে কামরাটা
ভুলবেন না।
রেলের কামরা
হয় বলে সব বড় বড় ষ্টেশনে
রাখা আছে, তাদের
কামরা পরিষ্কার রাখুন।
বিনামূল্যে এরা আপনার
করবে।
রাখবেন, পরিচ্ছন্ন কামরায়
আরো বেশী আরামদায়ক
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সুন্দর আকার
অনুপম নির্মাণ কৌশল
কার্যকারিতা ও
সৌন্দর্যে
সর্বদা অগ্রগামী
ওরিয়েন্ট
পাখা
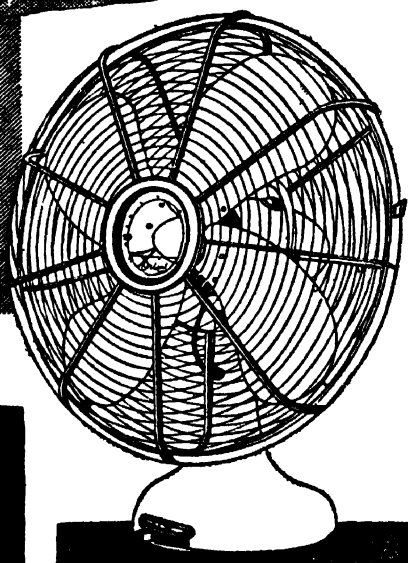
স্বাধীনতা বিপন্ন সর্ব্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জহরলাল নেহরু

বেশী উৎপাদন করুন,
কম ব্যয় করুন

উৎপাদনের ফল-গুলি দাবি করার প্রথম অধিকার হ'ল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার। প্রতি-রক্ষার জন্য যাতে বেশী জিনিষ-পত্র পাওয়া যায় সেজন্য আমাদের বেশী উৎপাদন করতে হবে এবং কম ব্যয় করতে হবে। এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতেও সাহায্য করা হবে। সমস্ত রকম ব্যয়বাহুল্য ও অপচয় বন্ধ [illegible]

আপনার [illegible]তা ভারতকে শক্তিশালী করবে

DA64/F3

শ্রী
"অতি বিশুদ্ধ
অতি পবিত্র
অতি বিশিষ্ট"
ঘি
অশোক চন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কটন স্ট্রীট • কলিকাতা-৭

মাসিক পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রবন্ধ

সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক নিউ প্রিন্টস্, ৩২।৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে নির্মলকান্তি ঘোষ কর্তৃক ১২৩, এস্. পি, মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাশিত। অফ্‌সেট কভার মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস্) ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। চিত্রমুদ্রণ : নবশক্তি প্রেস।

॥ নবশক্তি প্রেস ॥ স্বত্বাধিকারী : নবশক্তি নিউজপেপার্স
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৪ ॥

চতুষ্কোণ

নিয়মাবলী

- বৈশাখে বর্ষারম্ভ। প্রকাশকাল: প্রতি বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহ)।
- প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা। বার্ষিক চাঁদার হার সডাক বার টাকা; ষাণ্মাসিক সডাক ছয় টাকা।
- যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
- একসঙ্গে দুইটি বার্ষিক-গ্রাহক হলে প্রতি গ্রাহকের জন্য সডাক বার্ষিক ১০.০০ টাকা দিতে হবে। ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এ-নিয়ম ধার্য নয়।
- নমুনা সংখ্যার জন্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা পাঠাতে হয়।
- পাঁচ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা। ডাকখরচ আমরা বহন করি। অর্ডারের সঙ্গে পুরো দাম পাঠাতে হয়।
- এজেন্সির পত্রিকা ভি, পি, যোগে পেতে হলে ১.০০ টাকা পূর্বে জমা দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। এজেন্সি বন্ধ করবার সময়ে ঐ টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
- কোন মাসে অর্ডার বাড়াতে হলে আগের মাসের ২০ তারিখের পূর্বে আমাদের দপ্তরে জানাতে হবে।
- টাকাকড়ি ও ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র '**ম্যানেজার, চতুষ্কোণ : ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯** এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
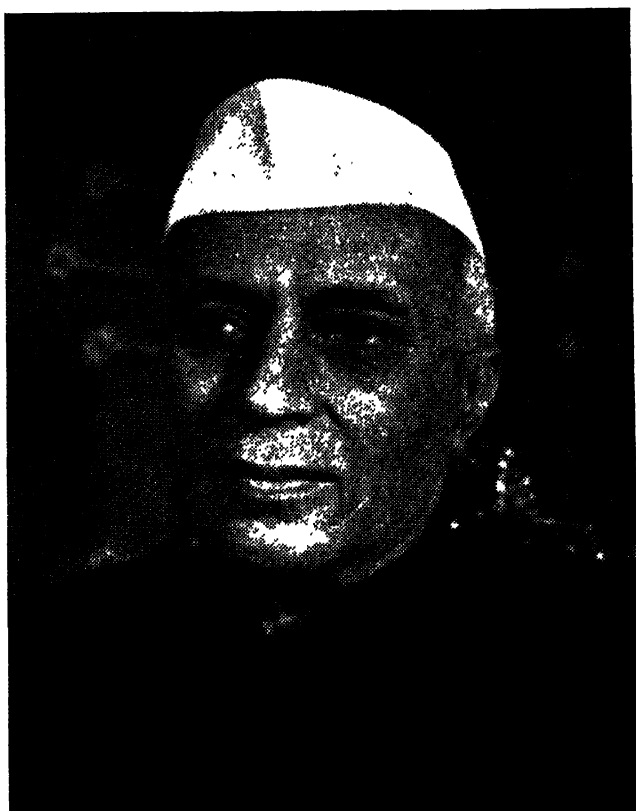
"ভারতের জনসাধারণের নিকট থেকে আমি এত স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি যে, তার এক কণাও পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। স্নেহ-প্রীতির ঋণ কে-ই বা শোধ করতে পারে। প্রশংসা অনেকেই পেয়েছেন, শ্রদ্ধা ও অনেকে কিন্তু সর্বস্তরের জনগণের অকৃপণ স্নেহ-ভালোবাসা আমার ওপর যেরূপ অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে তার তুলনা কোথায়? জনগণের এই দানে আমি ধন্য, আমি অভিভূত।"

—ইচ্ছাপত্রে জওহরলাল নেহরু

শ্রদ্ধানত চিত্তে
আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

পরিচালকবর্গ—"চতুষ্কোণ"

সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়

দীনেশচন্দ্র সেন

ইংরেজের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্ষপীয়র আর নব্যহিন্দুর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কে বড়, কে ছোট, এই বিষম সমস্যার উত্তর দিতে হইবে। কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক উত্তর দিয়াছেন,—সে উত্তর আমার পছন্দ হয় না। সেক্ষপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি!" সত্য-সত্যই কি কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের কবি, আর সেক্ষপীয়র জগতের কবি? এ উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু কালিদাসকে মেঘে উঠাইয়াছেন,—তাহা বেশ! সে বিমান-বিহারী কল্পনাশীল মহাকবির স্থান, আমরাও তন্নিম্নে নির্দেশ করি না। তবে সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়, ইহা ঠিক করিবে কে?

ইংলণ্ডে প্রকৃতি দেবীর বড় একটা মধুর হাস্য নাই—সেখানে প্রকৃতি শীত-ভীতা, ম্রিয়মাণা;—এখানে যেমন নবনীলজলদে শশি-লেখা শোভা পায়,—বিল্বার্কখদিরপূর্ণ, কপিত্থ-ধব-সংকুল কাননরাজি চিত্ত হরণ করে,—প্রতি সাধুপুষ্পিত উদ্যানে ভৃঙ্গের সপ্তম ঝঙ্কারে মন প্রীত হয়,—ইংলণ্ডে সে সব শোভা নাই। প্রকৃতি সে স্থানে শীত-ভীতা। যদি তবু বল;—চন্দ্র হাসে, সূর্য্য কিরণ দেয়; তাহা রোগীর হাস্যের ন্যায় নীরস,—আমাদিগের দেশের তুলনায় নীরস। সেক্ষপীয়র এ হেন বাহ্য প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বড় মুগ্ধ হন নাই,—প্রকৃতির কুসুম-উদ্যানে তিনি কালিদাস-ভ্রমরের ন্যায় উপমা খুঁজিয়া বেড়ান নাই। মানব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু সমস্ত মানব-প্রকৃতির নহে। তিনি ঋষিতুল্য পুরুষ দর্শন করেন নাই,—ইংলণ্ডে যেমন আমাদের দেশের মত ফুল্ল পদ্ম-কুসুম জন্মে না, সেইরূপ নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঋষিও সে দেশের অধিবাসী নহে। সেক্ষপীয়র আঁকিয়াছেন—ঝড়। যদি উল্কা দেখিতে চাও,—যদি মেঘ-সঞ্চারে বিদ্যুদ্দামের খর নর্ত্তন দেখিতে চাও—যদি ভালবাসার ঝড়ে কিরূপে হৃদগিরি বিধ্বস্ত হয়,—নৈরাশ্য কিরূপে উন্মত্তার ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু আনয়ন করে,—বীরের কুঞ্চিত

ভ্রূর নিকট কিরূপ ছিন্ন শারদীয় মেঘের ন্যায় সৈন্যরাশি উড়িয়া যায়, যদি দেখিতে চাও, তবে সেক্ষপীয়রে এসব সকলই পাইবে। ঝড়, বৃষ্টি, প্রাবৃট্‌কাল, অগ্ন্যুৎপাত, শিশির, কুসুম, তেজ, অশনি,—একত্র এক সেক্ষপীয়র।—এ সব বাহ্যপ্রকৃতির নহে,—অন্তঃপ্রকৃতির। তবে কালিদাস বড় কি সেক্ষপীয়র বড়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না,—এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। মেঘ বড়, কি ঝড় বড়,—দাবানল বড়, কি জলপ্লাবন বড়,—কোকিলের পঞ্চম ঝঙ্কার ভাল, কি প্রস্ফুট পদ্মকুসুমের শোভা ভাল, কে বলিবে? কে বলিবে নবোদিত বাল-ভানু সুন্দর, কি নববসন্তানিলচালিত মধুর-চারুপর্ণোদ্গত রক্তপলাশ সুন্দর? কে বলিবে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন বড়, কি বীণাধারী নারদ বড়? কে বলিবে সক্রেতিস্ বড় কি, এস্‌কাইলাস বড়? —ইহাঁরা দুই ভিন্ন উপকরণে নির্ম্মিত, ইহাঁর কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় হয় না। যদি বল ইহাঁরা উভয়েই কবি, সুতরাং একশ্রেণীর লোক, ইহাঁদের তুলনা কবিত্বাংশে এক স্থানে হইতে পারে,—একথা ভুল, ইহাঁরা দুই ভিন্ন জিনিষে নির্ম্মিত, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের শত যোজন দূরে, ভারতীয় কবিতা, ইংলণ্ডীয় কবিতার শত যোজন দূরে। নামে শুধু মিল থাকিলে হইবে কি? তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, সেক্ষপীয়র সমস্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়, প্রতিভা ইহা হইতে বড় হইতে পারে না। যে সব উপকরণে কবি তাঁহার নাট্য-মঠ রচনা করিয়াছেন, সে সব উপকরণে সেই নাটকগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর রচনা হয় না,—কালিদাস যে ক্ষেত্রে বিহার করিয়াছেন, যে ক্ষেত্র শত সুন্দর উপমা দিয়া তিনি সজ্জিত করিয়াছেন, -সে ক্ষেত্রে তিনি নিজে নিরুপম,—তাহার উপমা আর নাই।

যদি বলিতে, সেই অপূর্ব্ব-শক্তি-বিশিষ্ট, অন্ধকার চিত্র-অঙ্কনপটু জন্ ওয়েবষ্টার বড়, কি সেক্ষপীয়র বড়, তবে বরং একটা উত্তর দেওয়া যাইত। যদি পিল, গ্রীণ, মারলো, ন্যাশ, ফিলিপ, মেছেঞ্জার, সারলি, বোমেণ্ট, ফ্লেচার, ইহাদের সঙ্গে নাট্যাংশে সেক্ষপীয়রের স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিতে, তবে সঙ্গত হইত। এলিজাবেথিয়ান কবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সেদিন যে বিদ্যুতের ন্যায় বাইরণ কি শিলারের প্রতিভা য়ুরোপীয় সাহিত্যকাশ চমকিত করিয়া চলিয়া গেল,—সেই বাইরণ কি শিলারের সঙ্গে সেক্ষপীয়রের তুলনা করিয়া, যদি তাঁহাদিগকে সেক্ষপীয়রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, তবুও বুঝি সঙ্গত হইত, সে তুলনা এক ক্ষেত্রে। ভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনা দিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

সেক্ষপীয়র অদ্ভুত-প্রতিভাশালী। ঐ দেখ, করিওলেনাস যোদ্ধা একক সহস্র লোকের ভিড়ে দাঁড়াইয়া। সহস্র অসি তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত,—তাঁহার একটী জীবন বুঝি ধূমের মত লোক-বিদ্বেষ-তেজে উড়িয়া যায়। প্রবল-উত্তাল-তরঙ্গমালা-সংকুল ঘোর-গভীর-ঝটিকান্দোলিত সমুদ্রের মধ্যে অর্ণব-পোতের জীবননাশের আশঙ্কা; আর আজ করিওলেনাসের জীবননাশের আশঙ্কা এক। বৃদ্ধ সিনেটারগণ তাঁহাকে পরাভব মানিতে কত অনুনয় করিতেছেন—তাঁহাকে সেই জ্বলন্ত হুতাশনবৎ ক্রোধ-প্রদীপ্ত ভিড়ের মধ্য হইতে আনিতে কত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু করিওলেনাস নিরুত্তর,—নিঃশব্দে, ক্রোধে স্ফীত হইতেছেন। যে মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা বড় বেশি, সেই মুহূর্ত্তে অনুনয়াকরী বৃদ্ধ বন্ধুর হস্ত জোরে ত্যাগ করিয়া, অসি নিষ্কাসিত করিয়া একটী মাত্র কথা বলিলেন,—সেক্ষপীয়র সেই একটী কথায় তাঁহার চরিত্র আঁকিলেন;—

Cor,—(Drawing his sword)

No ; I'll die here

এই বীরত্ব মাতার নিকট পরাস্ত। পাঠক, দেখ দেখ—এখানে ফুল দিয়া বিধি শাল্মলীতরু কর্ত্তন করিতেছেন! ঐ যে বীর হুঙ্কারে দিক কাঁপায়,—মাতার নিকট সেই অজেয় যোদ্ধা জিত। একবার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য পাঠক দেখ, দেখ! বীরের মান, বীর মাতৃস্নেহের দেবমন্দিরের নিকট বলি দিতেছে। কিন্তু সেই মান বিসর্জ্জন দিতে মানী মাতার নিকট বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে বলিতেছে,—

Well, I must do't :

Away my disposition, and possess me

Some harlot's spirit ! My throat of war be turned
Which quired with my drum into a pipe,
Small as eunuch, or the virgin voice
That babies lull asleep !
Mother ! I am going to the market place ;
Chide me no more :—

কিন্তু সে বাক্যদান বৃথা। সেক্ষপীয়র তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে আঁকিবেন না। তিনি যে মুখ দিয়া তোমার কথা বাহির করাইলেন,—সেই মুখ দিয়াই কথা ভঙ্গ করাইলেন,—তোমার চরিত্র ঠিক রাখিলেন। করিওলেনাস যখন রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন,—তখন যে কথা বলিয়াছেন,—তেমন পরুষ-বচন কি কেহ শুনিয়াছে?

You common cry of curs !

whose breath I hate.

As reek of the rotten fens,

whose loves I prize

As the dead carcases of unburied men

That do corrupt my air,—I banish you ;

And here remain with your uncertainty !

Let every rumour shake your hearts !

Your enemies, with nodding of their plumee

Fan you into dispair !—Despising,

For you, the city, thus I turn my back.

There is a world elsewhere."

আর ঐ দেখ, ম্যাকবেথ আকাশে উদিত ক্ষীণ নক্ষত্রপংক্তিকে মুখ ঢাকিতে বলিয়া,—স্থির ধরিণী তাহার পদক্ষেপে যেন কম্পান্বিত, নিদ্রা যেন তাহাকে খড়্গহস্ত দেখিয়া শিহরিত,—অনুভব করিয়া চোরের ন্যায় রাজ-প্রাণনাশ মনস্থ করিয়া ছুটিল। সেই ভয়ঙ্কর-কার্য্য অনুষ্ঠানের প্রাকালে একবার শুধু বলিয়া গেল,—

"Thou sure and firm-set earth

Hear not my steps, which way they walk for fear,

Thy very stones prate of my whereabout."

তাহার স্ত্রীও বলিয়াছিল,—

"Let not heaven peep

through the blanket of the dark,

To cry, Hold, Hold !

কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যখন স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ম্যাকবেথ শুনিল, তখন তাহার মুখে দর্শনশাস্ত্রের সত্য বাহির হইল। —প্রকৃত দুঃখে, প্রকৃত অনুতাপে, মনুষ্য দার্শনিকের চক্ষু লাভ করে!—এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর কতবার শুনিয়াছ,—একথা দুঃখী ম্যাকবেথের মুখে একবার শুন,—

"To morrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools,
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more : it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
signifying nothing."

একটী কৃষ্ণ দেহ অমিত-তেজা বীর ডেসডেমনাকে ভাল বাসিয়া ডেসডেমনাকে বধ করিল,—নিজেকে বধ করিল। কিন্তু সেই উন্মত্ত ঝড় দেখাইতে যাইয়া নিপুণ কবি ঝড়-তাড়িত কত সুন্দর কুসুমরাশি ছড়াইয়া ফেলাইলেন, তাহা দেখ দেখি। ওথেলো কৃষ্ণবর্ণ কদাকার, সেই কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধার হৃদয়-প্রস্তরে ডেসডেমনার মূর্ত্তি কত সুন্দর হইয়া বিম্বিত হইয়াছিল। ওথেলো পাগল হইয়া একবার বলিতেছে :—

—She could lie by an emperor's side and command him tasks ! World hath not a sweeter creature !

আবার বলিতেছে,—

An excellent musician
She can sing away the savageness of a bear !

আর যখন মাতৃসন্নিধানে, মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত যুবক, পিতার প্রতিকৃতি আর খুল্লতাতের প্রতিকৃতির বৈষম্য দেখাইতেছেন, তখন সেই কয়েক ছত্রে সেক্ষপীয়রের সমস্ত প্রতিভা সম্যক বিকাশ পাইয়াছিল ; সেই কয়েক ছত্রে, —বজ্রের ন্যায় কঠোর, কুসুমের ন্যায় কোমল, সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত কথা ছড়াইয়া আছে ! বাঙ্গালা প্রবন্ধে ঘন ঘন ইংরাজী উদ্ধৃত করিব না ! উদ্ধৃত করিয়া সেক্ষপীয়রের প্রতিভার শোভা দেখাইতে হইলে অন্ততঃ হ্যামলেট, কিংলিয়ার, ম্যাকবেথ, ওথেলো, এই চারি খানা পুস্তক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে হয়। এই অত্যাশ্চর্য্য মহীরুহের প্রতিপত্রে দর্প, প্রতিপত্রে অহঙ্কার,--প্রতিপত্রে উজ্জ্বল রাজসিক ধর্ম্ম। এই বৃক্ষের ভিত্তি—আত্মাভিমান-প্রসূত ভালবাসা। সেক্ষপীয়র ইংরেজ জাতির দর্পণ। যে সব জাতি রাজসিক ধর্ম্মের ঊর্দ্ধে পৌঁছে নাই, সেক্ষপীয়র তাহাদিগের দর্পণ।

সেক্ষপীয়র বড়, কি কালিদাস বড় ? কিরূপে বলিব ? মহাভারত, রামায়ণ, দুই বিপুল কাব্যতরু, ধর্ম্মতরু,—কল্পতরু—যাহা চাও তাহাই পাইবে। ইহাদের কাণ্ড সারবান, যুগ যুগান্তরে অক্ষয়, অমৃতভাণ্ডার ; যদি মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব সমুদ্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে বোধ হয় প্রলয়-অবসানে ভারতলক্ষ্মী সেই দুই অমৃতোপম মহাগ্রন্থ কক্ষে লইয়া আবার উঠিবেন। এই দুই মহাবৃক্ষ হইতে মন্দার কুসুমবৎ কয়েকটী ফুল ফুটিয়াছে,—তন্মধ্যে কালিদাস-পুষ্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই পুণ্যতরু-দ্বয়ের রস গ্রহণ করিয়া কালিদাস পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার প্রতিপর্ণে নবীন উজ্জ্বল বর্ণ।

সেক্ষপীয়র পৃথিবীর কবি- কালিদাস স্বর্গের কবি। কারণ, নির্ম্মল মন্দারকুসুম আর কোথায় ফুটে ? তেমন আনন্দ-লহরী আর কোথায় ছুটে ? সেই শোভন প্রতিরঞ্জিত দলে কত মাধুর্য্য ! এই বিশ্বসংসার কালিদাসের চক্ষে কুসুম-উদ্যান। মক্ষিকা হইয়া কালিদাস ইহা হইতে মধু সঞ্চয় করিয়াছেন। ভ্রমর হইয়া উপমালহরীগুঞ্জন করিয়াছেন, নবোদিত চন্দ্র হইয়া কালিদাস সাহিত্যাকাশে হাসিয়াছেন ;—তেমন হাসিতে আর কে জানে ? যখন বাল্মীকির রামায়ণরূপ মহাবৃক্ষ হইয়াছিল, তখন বোঝা গিয়াছিল,—যদি এই তরুর ফুল হয়, তবে তাহা লইয়া দিগঙ্গনা হাসিবে। সে শোভা প্রকৃতি-পটে আর ধরিবে না। যদি ইক্ষুদণ্ডে ফুল ফোটে, যদি খর্জ্জুর বৃক্ষে চন্দন তরুতে পুষ্প হয়, যদি পদ্ম কুসুমের কণ্ঠে সংগীত সুধা হয়, তবে তাহার তুলনা কোথায় ? কালিদাস ইক্ষুদণ্ডের ফুল,—খর্জ্জুর-চন্দন-তরুর অপূর্ব্ব পুষ্প, তাই কালিদাস অপার্থিব। সঙ্কুচিতা শকুন্তলার সলজ্জ দিব্য লাবণ্য কি মধুর ! কি হৃদয়গ্রাহী ! সেই যে দুষ্মন্তের চিত্ত চীনাংশুক-রচিত কেতুর ন্যায় পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে অথচ বাধ্য হইয়া শরীর পুরোভাগে অগ্রসর হইতেছে ; সেই তপোবনবিহারিণীর স্বভাবজ রূপমণ্ডনহীন হইয়াও শৈবাল-রম্য-কমলিনীর ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে, আর তদ্বিরহে কামের কুসুমশর এবং ইন্দুর শীতরশ্মি, বজ্রসারের ন্যায় রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে,—এ বিচ্ছেদ, এ প্রেম কাহিনী কত সুন্দর, চক্ষু ভরিয়া দেখ দেখি ! গিরিবিহারিণী পার্ব্বতী স্তন-ভিন্ন-বল্কলা হইয়া দ্রুত চলিতেছেন, কভু বা কপট সন্ন্যাসীর সহসা শিব বেশ দর্শনে প্রতিহত তরঙ্গিনীর ন্যায় পাদৈক উত্থিত করিয়া চকিতে দাঁড়াইতেছেন,—এসব চিত্র যিনি একবার পড়িয়াছেন, তিনি ভুলিবেন না। বংশীধ্বনির ন্যায় এ সৌন্দর্য্য তাঁহাকে যাবজ্জীবন মুগ্ধ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে।

বসন্ত—প্রিয়সখা কামের সঙ্গে, হিমগিরি-শৃঙ্গে উপনীত হইল,—তাহার আগমনে মাধবীলতা গন্ধপূর্ণা হইল,—কুন্দগুল্ম পুষ্পিত হইল, রঞ্জক আর নাগবৃক্ষের শোভা আরও মনোহর হইল। বসন্ত,—সদ্যঃপ্রবালোদ্গমচারু-পত্র নব-চূত-কুসুমশরে দ্বিরেফপংক্তি দ্বারা যেন কামদেবের নামাক্ষর সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। অশোকপুষ্পের রঞ্জিত দল পৃথিবীর বক্ষে পড়িয়া কামকর-লাঞ্ছিত যুবতীর উরসের শোভা প্রকটিত করিয়াছিল; বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছিল; পাখী কাকলী দ্বারা সেই তপোবন মুগ্ধ করিয়াছিল—সেই সময়ে নন্দীর শাসনে ফুল ফুটিতে যাইয়া ফুটিল না; বৃক্ষ-পত্র সমীর-সঞ্চারে কাঁপিতে যাইয়া নিষ্কম্প হইল; পাখী সুললিত স্বর ছড়াইতে যাইয়া মূক হইল; দ্বিরেফ মধু লুটিতে যাইয়া লুটিল না,—সমস্ত বনপ্রদেশ আলেখ্যের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল। পার্শ্বে যোগী দেবদারু-দ্রুম-বেদিকায় সমাসীন। তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার দুই করপল্লব অঙ্কে স্থাপিত; তাহা প্রফুল্ল রাজীবের ন্যায় সুন্দর। ইন্দ্রিয়নিরোধহেতু তিনি অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায় স্থির, নিস্তরঙ্গ জলধির ন্যায় শান্ত, নিবাত দীপশিখার ন্যায় নিষ্কম্প। কালিদাস যদি সেক্ষপীয়রের ওথেলো না আঁকিতে পারেন,—সেক্ষপীয়র এরূপ শিবচিত্র আঁকিতে হার মানিবেন। আর সেই ১২০ শ্লোকে উপমার অদ্ভুত লীলা, সৌন্দর্য্যের রসসাগর, ভাষার অমূল্য ভাণ্ডার, রত্নাকরসদৃশ মেঘদূত কে পড়িয়াছে এবং পড়িয়া ভুলিতে পারিয়াছে!

কালিদাসের প্রতিচ্ছত্র কবিত্বপূর্ণ! সে যেন একাধারে ভ্রমরগুঞ্জন, বীণার নিক্কণ, কুসুমের গন্ধ, কুসুমের শোভা। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে কালিদাসের রাজ-সিংহাসনের নিকট অন্য কবিগণের রাজস্ব দেয়।

ভারত-ভাণ্ডারে কোহিনুর লুণ্ঠিত, সোমনাথ লাঞ্ছিত, অগণিত রত্নরাজি এদেশ হইতে নীত হইয়া পরকীয় কিরীট-কুণ্ডলে শোভমান। ভগবানের শ্রীদেহ-সৌষ্ঠব কৌস্তুভমণি পর্য্যন্ত এদেশ হইতে অপহৃত। তথাপি এই দলিত লাঞ্ছিত দেশে হিন্দু আজ অষ্টশত বৎসরের লাঞ্ছনা ভুলিয়া সাহিত্যের শত রত্নখনি প্রীতিব্যঞ্জক নেত্রে দর্শন করিবে। শাস্ত্রের তাজ শিরে পরিয়া হিন্দু আজ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় নিজেকে উচ্চ জ্ঞান করিবে। *

* ৭৩ বছর পূর্বের শেক্সপীয়ার-আলোচনার একটি নিদর্শন॥ ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জন্মভূমি' থেকে পুনর্মুদ্রিত॥

20
5
64
SHAKESPEARE
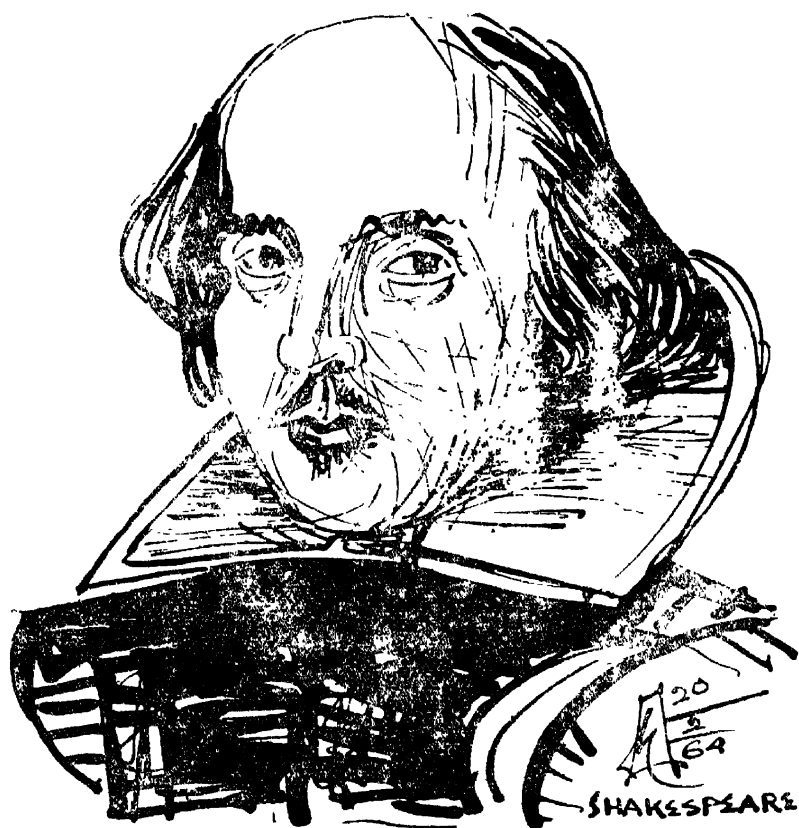
মধু, দি শেক্‌স্‌পীআরিষ্ট : একটি দৃষ্টিকোণ

পল্লব সেনগুপ্ত

১. কাল—উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের একেবারে গোড়ার দিক; স্থান—হিন্দু কলেজ, গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রীজ-এর (১) ক্লাস, পাত্র—দু'টি বালক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং মধুসূদন দত্ত। বিষয়—তর্ক।

ছেলেমানুষের তর্ক, ছেলেমানুষিতেই সামিল, কিন্তু দুই সহপাঠীর তর্কের উপজীব্যটা বড় মজার; নিউটন এবং শেক্সপীআরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই নিয়ে বিবাদ! ভূদেবের নেতৃত্বে নিউটন-পন্থীরা সংখ্যায় অনেক এবং বেচারী উইলিআম শেক্সপীআরের স্বপক্ষে একা মধুসূদন! কাজে কাজেই সেই শিশু-পার্লিআমেণ্টে ভোটের জোরে শেক্সপীআর খারিজ হতেই বসেছিলেন আর কি! কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই বাঁচিয়ে দিলেন, স্বয়ং অধ্যাপক রীজ! সে কথায় আসছি একটু বাদে।

ঝগড়াটা প্রায় তিনমাসের পুরোনো। গণিত-বিমুখ এবং সাহিত্য-প্রেমী ছাত্র মধুসূদন, তাঁর সওয়ালের শেষ কথা হিসেবে বলেছিলেন, "শেক্সপীআর চেষ্টা করলেই নিউটন হতে পারতেন; কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে কখনই শেক্সপীআর হতে পারতেন না, ব্যস!" তিন মাস পরে রীজ সাহেবের ক্লাসে কথাটা আবার উঠল। ইতিমধ্যে, একটি জটিল অঙ্ক কষতে দিলেন অধ্যাপক রীজ। অঙ্ক-কষিয়ে বলে বিখ্যাত ছাত্ররাও যখন উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন, তখন সবাইকে বিস্মিত করে উঠলেন, স্বভাবত গণিত-বিমুখ মধুসূদন! বিস্ময় আরও বাড়ল, যখন মধুসূদন অঙ্কটি ঠিক ঠিক করলেন এবং ব্ল্যাক-বোর্ড থেকে ফিরে এসে গম্ভীর মুখে ভূদেবের পাশে বসে বললেন; "কেমন, শেক্সপীআর যে চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন দেখলে তো?" ভূদেব, নির্বাক!

ব্যাপারটা খুবই ছেলেমানুষি, নিঃসন্দেহে। নিজেকে শেক্সপীআরের প্রতিভূ দাঁড় করিয়ে, একটি অঙ্ক কষার মাধ্যমেই 'নিউটন বনাম শেক্স-পীআর'-এর মজাদার লড়াইয়ে জিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা—সমস্ত ব্যাপারটাই ছেলেমানুষের খেয়াল-খুশী ঠিকই! কিন্তু এই সামান্য একটি

ঘটনা থেকে একটা বিশেষ মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়, যে মনস্কতা, পরবর্তীকালে মধুসূদনের জীবন ও মননের সর্বত্র আরও উজ্জ্বল, সংহত এবং পরিণত।

ভারতবর্ষকে যাঁরা শিখিয়েছেন শেক্সপীআরকে ভালবাসতে, তাঁদের দীক্ষাগুরু ছিলেন, হিন্দু কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, কবি-সৈনিক এবং সমালোচক—ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। রিচার্ডসনের শেক্সপীআর অধ্যাপনা সেই আমলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল—এটা স্মর্তব্য। (২) এই অধ্যাপকের প্রিয়তম ছাত্রদের একজন মধু; কাজে কাজেই শৈশব থেকেই যে তাঁর মন শেক্সপীআর-ঘরাণায় তালিম পেয়ে তৈরী হয়ে উঠেছিল, এতে আর আশ্চর্যের কি?

প্রকৃতপক্ষে, শেক্সপীআর-বনাম-নিউটনের লড়াই, কি, সহপাঠী বঙ্কু-বিহারীকে (৩) 'Banquo' (৪) বলে ডাকা, এইসব ছেলেমানুষি ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও, শেক্সপীআর-সাধনা মধুর শুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজ থেকেই। ভূদেবের সঙ্গে ঐ 'ঝগড়া'র বহু আগেই, ১৮৩৪ সালে, মধু যখন হিন্দু কলেজের নীচু ক্লাসের ছাত্র তখনই, কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে, 'ষষ্ঠ হেনরী' নাটকের পাঠ-অভিনয়ে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। (৫)

হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় রচিত মধুসূদনের যে সমস্ত লেখা আজ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যেও 'শেক্সপীআরীয়তা' বিরল নয়। হিন্দু কলেজের তরুণ কবি, মধুসূদন দত্ত 'সনেট' লিখতে গিয়ে শেক্সপীআরের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বার বার, যদিও সে প্রেরণা কতটা রূপায়িত হয়েছে, সেটা তর্কাতীত নয়। ছাত্রাবস্থায় 'অষ্টক-ষটক' মেনে পেত্রার্কীয় সনেট মধুসূদন লেখেন নি, পরে অনেক বাংলা-সনেটে ঐ রীতির অনুসরণ করেছেন; অবশ্য শেক্সপীআরীয় 'চার-চার-চার-দুই' অর্থাৎ 'ক-খ ক-খ গ-ঘ গ-ঘ ঙ-চ ঙ-চ ছ-ছ' পদ্ধতির সনেটই তাঁর ঐ আমলে বেশি। তবে 'ক-খ-খ-ক' ইত্যাদি রীতির সনেটও যে একেবারে নেই, তা নয়। আরও একটা কথা বিবেচ্য; প্রথম বারো চরণের সারাৎসার হিসেবে, শেক্সপীআরীয় সনেটে যেমন শেষ দু'টি লাইন রচিত হয়, সেই নিখুঁত ভাব-বিভাজনটা মধুসূদনের ইংরাজী সনেটে, যা তিনি ছাত্রাবস্থায় লিখেছিলেন, সর্বত্র থাকে নি। অবশ্য, এর ফলে তাঁর সনেট যে মিল্টনীয়

অখণ্ড-চতুর্দশী-তে পরিণত হয়েছে এমন কথা ভাববার হেতু নেই। মিল্টনীয় এবং অন্যান্য ধ্রুবপদী প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল আরও অনেক পরে। বরং, এই সনেটগুলিকে শেক্সপীআরীয় রীতির অপরিণত-ফসল হিসেবেই গণ্য করা উচিত। (৬)

হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় লেখা, মধুসূদনের দু'টি প্রবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একটি সাহিত্য-সম্পর্কিত, এবং তাতে প্রাসঙ্গিকভাবে শেক্সপীআর সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখও দেখি। (৭)

২, এরপর, ভাগ্যান্বেষী যুবক উইল শেক্সপীআরের অজ্ঞাতবাসে ও পরে লণ্ডনে যাত্রা করার মত মধুসূদনকেও দেখা গেল সবার অগোচরে মাদ্রাজে পাড়ি দিতে, ঐ ভাগ্যান্বেষণেই। সেখানে মধুসূদনকে আমরা দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষক ও সাংবাদিক রূপে। (৮) হিন্দু কলেজের চপল ও প্রতিভাশালী ছাত্র মধুসূদন এতদিনে পরিণত বয়স্ক যুবক, সুপরিচিত সাহিত্যিক। শেক্সপীআরের দেশে যাবার বাসনা তাঁর তখনো প্রগাঢ়, কিন্তু, শেক্সপীআরের সনেট-বান্ধব 'ডব্লু-এইচ' (৯) এবং সনেট-প্রিয়া 'শ্যামাঙ্গিনী'র (১০) মতো তাঁর নিজের বাল্য-কাব্যের কুশীলব বন্ধুবর 'জি-ডি-বি' (১১) এবং মানসী 'নীলনয়না'র (১২) উদ্দেশ্যে সেন্টিমেণ্ট নিবেদনের পালা, ততদিনে সাঙ্গ! জনৈকা 'নীলনয়না', (১২-ক) তখন তাঁর গৃহলক্ষ্মী!

মধুসূদনের মাদ্রাজের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস এক অপূর্ব ধূপ-ছায়ায় মেশানো। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম স্বীকৃতিসূচক বইয়ের (১৩) জন্মভূমি মাদ্রাজ : তাঁর একমাত্র ইংরাজী গদ্যগ্রন্থ, (১৪) তা-ও লেখা মাদ্রাজে। নাটক রচনার সূত্রপাত (১৫), সে-ও ঐ তামিলভূমিতেই! অথচ, তাঁর মাদ্রাজবাসকালীন বহু লেখা বিলুপ্ত এবং বিস্মৃত, যার ফলে তাঁর সাহিত্য-সাধনার ধারাক্রম রচনা আজও অপূর্ণ!

মধুসূদনের মাদ্রাজবাসকালীন ইংরাজী পুস্তিকা-প্রবন্ধ, 'দি অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যাণ্ড দি হিন্দু'-র মধ্যে শেক্সপীআরোল্লেখ বেশ কয়েকবার খুঁজে পাওয়া যায়ঃ অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং ভারতীয় জাতিদুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ইতিহাসের দ্বন্দ্বচেতনায় তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে মধুসূদন অনেককিছু নতুন কথা শুনিয়েছেন, যার উপসংহারটি অনবদ্যভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের তাবৎ মহাসাহিত্য সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মমতা দেখিয়েও তিনি পরিশেষে 'বাছা

ফলস্টাফ, জ্যাক ফলস্টাফ'-এর সাহিত্যকেই কাম্যতম বলে ঘোষণা করেছেন। (১৬) ভার্জিল, হোমার, ওভিদ, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, মিল্টন, সাদী, পেত্রার্ক—সকলের কাব্যের পরেও, শেক্সপীআরকেই শ্রেয়তম বলে দাবী করাটা সেই পূর্ব-কথিত বিশেষ মনস্কতা-রই প্রতিভাস ছাড়া আর কি বলব ?

এই পুস্তিকা-প্রবন্ধটির ভাষাও মধুসূদনের স্বভাবধর্মানুগ কাব্যস্পন্দী ; শেক্সপীআরীয় বাচন এবং উদ্ধৃতি সহ মাইকেল তাকে প্রসারিত করেছেন এর মধ্যে, এটাও স্মর্তব্য। (১৭)

৩. মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন কলকাতায় পাকাপাকিভাবে ফেরেন ১৮৫৬ সালে। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'র ইংরাজী-অনুবাদ (১৮৫৮) করার পর মধুসূদন ঐ নাটকের আদর্শে নিজের নাটক লিখলেন, 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) এবং অচিরেই তার ইংরেজী অনুবাদ করলেন প্রকাশ। খাঁটি ভারতীয় আদর্শ অনুসরণ করে লেখবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, শেক্সপীআরকে তিনি বিস্মৃত হন নি। 'শর্মিষ্ঠা'র আখ্যাপত্রে 'জুলিআস সীজার' থেকে সিনা এবং নাগরিকদের সংলাপ উদ্ধৃত করে সম্ভবত নিজের স্বভাববিরুদ্ধভাবেই কবিত্ব-অক্ষমতা (!) প্রকাশ করতে বিনয়ী হয়েছেন ! (১৮)

'শর্মিষ্ঠা' প্রসঙ্গে, মধুসূদনের মননের ওপর আর একটি পরোক্ষ-শেক্সপীআরীয় প্রভাবও পড়ে যায় বলে মনে করা যেতে পারে। ইউরোপীয় ক্লাসিক-নাটকের গঠন-বৃত্তকে অস্বীকার করে শেক্সপীআর, তাঁর নাটকে 'স্থান-কাল-ঐক্য' সম্পর্কে নতুন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই, মধুসূদন, বাংলা নাটকে, সংস্কৃত-নাট্যতত্ত্ব নির্দেশিত 'অঙ্ক'-রীতিকে অগ্রাহ্য করে অলঙ্কার-বিদ্রোহ করেছেন। (১৯)

মধুসূদনের পরবর্তী নাটকগুলিতে শেক্সপীআরীয়তা কিন্তু প্রত্যক্ষতর। 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকের সংলাপে শেক্সপীআর-আদর্শায়িত ভঙ্গ ও অভঙ্গ অমিত্র-ছন্দ ব্যবহার করে মধুসূদন বাংলা নাটকে এক নতুন দিগন্ত-মুক্তি ঘটালেন। (২০)

নাট্যসাহিত্যে, এর পর মাইকেল লেখনী ধারণ করেন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অনুবাদের মাধ্যমে (১৮৬১)। কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও ঐ নাটকেও শেক্সপীআর-সংক্রান্ত একটি কথা, আছে, এটা কিন্তু খুব

মজার ! (২১) অবশ্য মূল বাংলা নাটকেই এটি আছে, সুতরাং এ সম্পর্কে মাইকেলের কোন দায় নেই !!

মাইকেলের নাটকে শেক্সপীআরীয়ত্ব ভুজে উঠল তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকের মধ্যে। গ্রীক নাটকের প্রভাব এর মধ্যে কোনো কোনো সমালোচক খুঁজে পেলেও, এর কাঠামো এবং রূপায়ণে শেক্সপীআর-সংস্কার প্রখর। শেক্সপীআরের বিভিন্ন দৃশ্য-শৈলী ও চরিত্রের চিন্তা এবং ছায়াপাত যে এই নাটক রচনাকালে এসেছে, তা স্বয়ং তিনিই স্বীকার করেছেন। (২২) শেক্সপীআরের একাধিক নাটকের দৃশ্য এবং সংলাপের অনুপ্রেরণায় যে 'কৃষ্ণকুমারী'র দৃশ্য ও সংলাপ রূপায়িত, এটাও সুস্পষ্ট। (২৩) 'কৃষ্ণকুমারী' সংক্রান্ত তাঁর পত্রাবলীতে ঐ প্রগাঢ় শেক্সপীআর-ধর্মিতার প্রমাণ সমর্থিত।

ঐ 'কৃষ্ণকুমারী'-পত্রাবলী প্রসঙ্গেই, শেক্সপীআরের নাট্যধর্ম এবং তার বিচিত্রতা সম্পর্কে মধুসূদনের বিভিন্ন চিন্তার একটা রূপচিত্রণ পাওয়া যায়। শেক্সপীআরীয়-নাট্য সমালোচনার নীতিতে তাঁর নাটক বিশ্লেষণ করা যে অসঙ্গত এই কথা বলা এবং সেই অসঙ্গতির হেতু নির্দেশ করা (২৪); শেক্সপীআরের নাটকের রোম্যান্টিকতা কতখানি বিস্তৃত, সে সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করা এবং এদেশী নাটকের সঙ্গে তাদের তুলনা করা (২৫); শেক্সপীআরের নাটকের প্রথম যুগে অভিনয়-কুশলতার আলোচনা করা (২৬); নিজের ইমোশন এবং সেন্টিমেণ্টকে প্রকাশ করতে শেক্সপীআরের সংলাপ (২৭) আবৃত্তি করা, এ সবই ঐ চিত্রণের বিভিন্ন অংশমাত্র। শেক্সপীআরের কবিতার পাশে নিজের কবিতাকে দাঁড় করিয়ে বিচার করার মতো উখেল্লযোগ্য ঘটনাকে আমরা তাঁর পত্রাবলীতে খুঁজে পাই। (২৮) সাধারণ কথাপ্রসঙ্গে শেক্সপীআরোল্লেখও যথেষ্ট। (২৯)

৪. কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন, পরিণত বয়সে মূলত অ-শেক্সপীআরীয় রীতির সনেট লিখতেন। তবে কাব্যে, মধুসূদনের ওপর শেক্সপীআরীয় যুগ ও জীবনের উদ্ভাসিত প্রেরণাটা অন্যত্র। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডেরই শুধু নয়, বুর্জোআ-বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে, সারা ইউরোপেরই সাংস্কৃতিক প্রেরণাটা ছিল মানবতাবাদে উন্মুখ। পরবর্তী তিনশো বছর বুর্জোআ-মনীষীরা যে মানবতাবাদকে চর্চা এবং ব্যাখ্যা করে ইতিহাসের সুসঙ্গত এবং স্বাভাবিক বিবর্তনকে রূপায়িত করেছেন, সেই মানবতাবাদের-

জয়গানে কম্বুকণ্ঠ হয়েছিলেন নিজের সাহিত্যে যে মহামানব, তাঁর নাম উইলিআম শেক্সপীআর। বুর্জোআ-রেনাসাঁসের আদি-পর্বের মানবতাবাদী বিপ্লবে মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য, ছত্রে ছত্রে। মধুসূদনের কবিতায় কি ঐ বিপ্লবেরই বাণীকে আমরা খুঁজে পাই না?

উনিশ শতকের 'নব্য-বঙ্গ'রা প্রতীচ্যের আলোকে মানবতাবাদকে চিনতে শিখেছিলেন, মানতেও। ঐ 'নব্য-বঙ্গ' আন্দোলনের পরিণততম ফলশ্রুতির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বুর্জোআ-বিপ্লবের মানবতাবাদী অংশের প্রকাশটা একমাত্র 'নব্য-বঙ্গ' গোষ্ঠীই দেখিয়েছিলেন তা অবশ্য নয়—রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সামাজিক-মধ্যপন্থীরাও সেই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। মনে রাখতে হবে, এই দুই গোষ্ঠীর মিলনের দৃঢ়তম গ্রন্থিও কিন্তু মধুসূদনই। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর 'লিজেণ্ডারী' বান্ধবতা, ঐ দুই গোষ্ঠীর সমদর্শিতাকে পিনদ্ধ করেছিল, অকথা অনস্বীকার্য। এবং মনে রাখতে হবে বাংলা দেশে প্রথম যুগের শেক্সপীআর-অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর! (৩০)

সমাজে, বুর্জোআ-বিপ্লবের মানবতাবাদী বাণীকে প্রসারিত করার সমান্তরাল দায়িত্ব সাহিত্যে যাঁরা বহন করেছিলেন, তাঁদের অগ্রপথিক মধুসূদন। শেক্সপীআর-শাস্ত্রে এদেশের আদি-গুরু রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র মাইকেল যে, ঐ দায়িত্ব বহনের অভিব্যক্তি যে শেক্সপীআর-ধর্মিতাতেই নিবিড় করবেন, এতে আর আশ্চর্য কি? 'মেঘনাদ বধে' মহাকবির বহিরঙ্গিক প্রেরণাও "ফ্যান্সী'স চাইল্ড—সুইট শেক্সপীআরেরই" উত্তরসূরী জন মিল্টনের আদর্শান্বিত, এটুকু অবশ্য স্মর্তব্য।

৫. জীবনের তীর্থযাত্রা সেরে ইংলণ্ড থেকে যখন মধুসূদন ফিরেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং শেক্সপীআরীয়-ট্রাজেডির চতুর্থ অঙ্কের নায়ক। অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বল্গাবিহীন উদ্দামতা এবং পার্থিব অবিবেচনাসমূহের রন্ধ্রপথে তাঁর নিজের জীবনই প্রতিনায়ক হিসেবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে পরাভূত করেছে। জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যে, প্রিয়তমা আঁরিয়েতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে ম্যাকবেথের আকুল বিলাপ আবৃত্তি করেছিলেন মধুসূদন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে:

> "To-morrow, and to-morrow, and to-morrow
> Creeps in this petty pace from day to day,
> To the last syllable of recorded time;

And all our yesterday have lighted fools
The way to dusty death. Out, out brief candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing—" (৩১)

অলৌকিকতা মানি না। কিন্তু এ কোন্ অনির্বচনীয় রহস্য? জীবনাবসানের প্রাক্-মুহূর্তে, অপরিমিত-উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিনষ্ট ম্যাকবেথের সঙ্গে নিজেকে এ ভাবে মিশিয়ে দেওয়ার মধ্যে জীবন-শিল্পী কবির কোন্ বিচিত্র-বিহ্বল শিল্পচেতনা মুখর হয়ে উঠেছিল ?

উত্তর মেলে না॥

---

(১) প্রসিদ্ধি আছে ইনি যৌবনে সম্রাট নাপোলিয়ঁর পতাকাবাহক ছিলেন।

(২) মেকলে, রিচার্ডসনের শেক্সপীআর-আবৃত্তি শুনে বলেছিলেন, "I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare."

(৩) বঙ্কুবিহারী দত্ত। ইনিই প্রথম বাঙালী-শেক্সপীআর সমালোচক। রিচার্ডসনের সম্পাদিত "Calcutta Literary Gleaner" পত্রিকাতে ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় "Some thoughts on Shakespeare" শীর্ষক একটি বিদগ্ধ ও বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন। বাঙালী লেখকের কলমে এইটিই প্রথম শেক্সপীআর-সমালোচনা।

(৪) মধুসূদন পরবর্তীকালেও এঁকে এই পরিহাস-বিজড়িত নামে ডাকতেন।" You astonish me by saying that old Banquo has not been written to, by me." [গৌরদাস বসাককে মাদ্রাজ থেকে ১৮৪৯ সালের ৬ই জুলাই তারিখে লেখা চিঠির অংশ।]

(৫) ১৮৩৪ সালের ১২ই মার্চ তারিখে "সমাচার দর্পণ" লিখছেন : "গত শুক্রবার [৭ মার্চ] টৌনহলে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।…ইহার পর নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।…

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্রইর

ষষ্ঠ হেনরি	—	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
গ্রইর	—	মধুসূদন দত্ত।"

(৬) উদাহরণত, মাইকেলের প্রথম জীবনে লেখা একটি শেক্সপীআরীয়-সনেট উদ্ধৃত করা গেল :

COMPOSED DURING A MORNING-WALK

I love the beauteous infancy of day,
The garlands that around its temples shine
I love to hear the tuneful matin lay
Of the sweet kokil perched upon the pine :
I love to see yon streamlet gaily run
And blush like maiden beauty meek and fair
When the bright beams of yon refulgent sun
Crowd on her trembling bosom pure and clear.
I love to see the Bee from flow'r to flow'r ;
Sucking the sweets, to him they smiling yield
I love to hear the breezes in the bower
Singing melodious, or along the field.
All those I love, and Oh ! in these I find
A balm to soothe the fever of my mind.

(৭) উদাহরণত :

(i) "For us the pages of Chaucer and Spenser and Shakespeare and Milton have charms which are often vainly sought for in more modern volumes :—The unlaboured lines of these masters which flow like a stream of music are rarely equalled by their followers."

(ii) "Including in the former such writers as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton and those who were either their contemporaries or preceded some of them : Altho' there are striking differences between these writers themselves,—yet they resemble each other in

one point—an absence of art and dependence upon nature." [হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় লেখা প্রবন্ধ "On Poetry Etc." থেকে উৎকলিত।]

(৮) মধুসূদন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের স্কুলবিভাগের চতুর্থ শিক্ষকরূপে ১৮৪৯ সালের শেষে নিযুক্ত হন এবং পরে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি মাদ্রাজে ১৮৫৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে "Hindu Chronicle" পত্রিকার সম্পাদক, "Madras Spectator" পত্রিকার সহঃ সম্পাদক এবং "Atheneum" এবং "Madras Circulator & General Chronicle" পত্রিকার স্তম্ভ-লেখক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(৯) William Herbert, Earl of Pembroke অথবা Henry Writhsoley বা অন্য কেউ। শেক্সপীআরের সনেটের এই W. H. স্বাক্ষরযুক্ত "Onlie begetter" বান্ধবটি যে কে, তা নিয়ে পণ্ডিত-মহলে বিবাদের অন্ত নেই!

(১০) "Dark Lady." Mistress Mary Fitton বা Mrs. Davenant বা অন্য কোনো বিবাহিতা মহিলা। 'সনেট-বান্ধবের' মতো শেক্সপীআরের এই 'সনেট-বান্ধবী'টির পরিচয় নিয়েও দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ আছে এবং তা হয়েছেও।

(১১) গৌরদাস বসাক। মধুসূদনের আজীবন অন্তরঙ্গতম বন্ধু। এঁকে উদ্দেশ করে বাল্যকালে মধুসূদন বহু কবিতা লিখেছেন।

(১২) এই 'নীলনয়না' 'ডার্ক লেডী'র মতোই রহস্যাবগুণ্ঠিতা। মনে করা যেতে পারে ইনি মধুসূদনের কৈশোরের স্বপ্ন-হৃদয়া, রেভাঃ কৃষ্ণমোহনের কন্যা দেবকী!

(১২ক) মাইকেলের প্রথমা পত্নী রেবেকা ম্যাকটাভিস।

(১৩) "The Captive Ladie & the Visions of the Past" (1849).

(১৪) "The Anglo-Saxon and the Hindoo (Lecture I) [1854]

(১৫) "Rizia : The Empress of Inde." [185—(?)] অধুনা অংশত বিলুপ্ত॥

(১৬) "…but give me the literature, the language of the Anglo-Saxon! Banish Peto, banish Bardolph, banish

Poins ; but for sweet Jack Falstaff, kind Jack Falstaff, true Jack Falstaff, banish him not thy Harry's Company ; banish plump Jack, and banish all the world.[1] (Henry IV)"

["The Anglo-Saxon & the Hindoo"]

(১৭) (i) "...that the melody of her vraginal ravished the hearts of her courtiers, falling upon their ears like the sweet south breathing upon a bank of violets, stealing and giving odour [1] (Shakespeare)." [ঐ]

(ii) "...as concealed love feeds on the damask cheek of the maiden like a worm in the bud[2] (Shakespeare)."

[ঐ]

(iii) "In the language of sweet but hapless Ophelia —'O ! What a noble mind is here o'erthrown ! the courtier's, soldier's, scholar's eye, tongue, sword, the glass of fashion and the mould of form, the observed of all observers [10] (Hamlet)." [ঐ]

(১৮) "Cin. I am Cinna—the poet

Cit. Tear him for his bad verses.

Julius Cæsar."

(১৯) "...and that is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."

[গৌরদাস বসাককে লেখা পত্রাংশ, ১৮৫৮ সালের একেবারে শেষের দিকে লেখা বলে অনুমিত ।]

(২০) যেমন :

"কি আশ্চর্য ! আহা !

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী ।

এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে

অক্ষম কি হইনু হে ?

কেনই বা হব ?

অমৃত যে দেহে থাকে শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে ?　দেখি ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ-সমীপে !
এ কি ?　ওই না সে পদ্মাবতী ?
আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ;" ("পদ্মাবতী", ৪।১, কলির স্বগতোক্তি।)

(২১) "…My dear, I have not forgotten the Bengali translation of "Shakespeare ;" it can not be got now in the shops, but one of my friends, Bonkima by name, has given me one copy."

["Indigo-planting Mirror" 2/1,
Bindumadhab's letter to Saralata]

(২২) "As far Dhanadas, I never dreamt of making him a counterpart of Yago. * * I wish Bullender to be serious and light, like "Bastard" in King John. * * * The only piece of criticism I shall venture upon is this ;—never strive to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan."

[কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীকে ১৮৬০ সালের ১লা
সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা পত্রাংশ।]

(২৩) উদাহরণতঃ—

(i) "ভৃত্য। (স্বগত) উঃ! কি অন্ধকার ! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না, (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান, এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে ? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। (সচকিতে) ও বাবা ! ও

কি ও! তবে ভাল! একটা পেঁচা, আমার প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছিলো। শুনেছি, পেঁচাগুলো ভুতুড়ে পাখী। তা হতে পারে, ও মধুর স্বর ভূতের কানে বৈ আর কার কানে ভাল লাগবে? দূর দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হল মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, আহার নিদ্রা রাজকর্ম্ম সকলই পরিত্যাগ করেছেন আর সর্ব্বদাই 'হা বিধাতঃ! আমার কপালে কি এই ছিল! হা বৎসে কৃষ্ণা! যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!' কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি! লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! এ কি সর্ব্বনাশ। এ কি নন্দী, না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে? উঃ। ও বাবা এদিকেই যে আসচে।"

["কৃষ্ণকুমারী", ৫।২, উদয়পুরের রাজ ভৃত্যের স্বগতোক্তি।]

এর সঙ্গে তুলনীয়—

"Porter. Here's a knocking indeed! If a man were porter of hell-gate, he should have old turning the key. (Knocking) Knock, knock, knock. Who's there i' the name of Beelzebul? Here's a farmer that hanged himself on the expectation of plenty: come in you'll sweat for't. —[Knocking] Knock, knock! Who's there, i'the devil's name? Faith, here's an equivocator, that could swear in both the scales against either scale; who committed treason enough for God's sake, yet could not equivocate to heaven: O, come in, equivocator. [Knocking] Knock, knock, knock! Who's there? Faith, here's an English tailor come hither, for stealing out of a French hose: come in, tailor, here you may roast your goose.—

(Knocking.) Knock, knock : never at quiet ! What are you ? —But this place is too cold for hell. I'll devil-porter it no further : I had thought to have let in some of all professions, that go the primerose way of eternal bonfire. (Knocking.) Anon, anon ! I pray, you remember the porter."

["Macbeth", 2/1, Porter scene]

(ii) "রাজা। রজনী দেবী বুঝি পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন, আর চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জন কচ্ছেন। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার ! কি কালস্বরূপ অন্ধকার ! হে তমঃ ! তুমি আমাকে গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছ ? উঃ ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্ছেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! এ কি প্রলয়কাল ? তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হোক না ? [ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া] হে কাল ! আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র ! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি ! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ ? —বিনাশ কর। কৈ এখনও বজ্রাঘাত হল না ? কৈ বিলম্ব কেন ? [হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া] এই নেও ! এই নেও ! [কিঞ্চিৎ নীরব] কৈ, বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্লেন না কি ? [বিকট হাস্য] * * * পরমেশ্বর ! কি কল্লে ?—মৃত্যু হবে না ? কেন হবে না ? কেন ?—আঁ্যা ! কি হবে ? তবে কি হবে ? আমার কি হবে ? [রোদন]"

["কৃষ্ণকুমারী", ৫।২, কন্যাবিয়োগের আশঙ্কায় উন্মাদ রাজার প্রলাপ]

তুলনীয়—

"Lear. Blow, winds, and crack your cheeks ! rage ! blow !
You cataracts and hurricaneous, spout
Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks !
You sulphurous and thought-executing fires

Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head ! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world !
Crack nature's moulds, all germerns spill at once,
That ingrateful man. * * *
Rumble thy bellyful ! Spit, fire, spout rain !
Nor rain, wind, thunder, fire, are my daughters :
I tax not you, you elements, with unkindness ;
I never gave you kingdom, call'd you children ;
You owe me no subscription : then let fall
Your horrible pleasure ; here I stand, your slave,
A poor infirm, weak, and despis'd old man.—
But yet I call you serville ministers,
That will with two pernicious daughters join
Your high-engender'd battles 'gainst a head
So old and white as this. O ! O ! tis foul."

["King Lear", 3/2 ; নিপীড়িত, বিড়ম্বিত উন্মাদপ্রায় রাজার প্রলাপ ।]

(iii) তুলনামূলক ভাবে সুদীর্ঘ সংলাপের উধৃতি আরও দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা অধুনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন কর্ডেলিআর মৃত্যুর পর লীআরের এবং কৃষ্ণার মৃত্যুর পর ভীমসিংহের বিলাপ। "কৃষ্ণ-কুমারী" নাটকের অলৌকিক অংশটি—কৃষ্ণা কর্তৃক আকাশে পদ্মিনীর ছায়ামূর্তিকে দেখা এবং তার সঙ্গে কথা বলা (৩।২ এবং ৫।৩) একটি পরিচিত শেক্সপীআরীয় নাট্যকৌশল। ম্যাকবেথ কর্তৃক ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাকে দর্শন এবং হ্যামলেট কর্তৃক পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে কথোপকথন স্মর্তব্য।

(২৪) "Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a drama of mine, begin to apply the cannons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare.

They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assumes a milder shape."

[রাজনারায়ণকে লেখা পত্রাংশ, ১৮৬১-র মাঝামাঝি সময়।]

(২৫) "Look at the splendid Shakespearean drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name Romantic? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic. In the great European Dramas you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems."

[কেশব গাঙ্গুলীকে লেখা পত্রাংশ ১৮৬০-এর শেষাংশ।]

(২৬) "Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect than ours."

[ঐ, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৬০]

(২৭) "...as the boatswine says in the 'Tempest'. 'Heigh, My hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare Take in, the topsail; tend to the Master's whistle. Blow till thou burst thy wind, if room enough!"

[ঐ, ১৮৬০ সালের শেষাংশ]

(২৮) আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

চুম্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা ?

By the bye these lines will no doubt recall to your mind the lines··· ···

Like the sweet south
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour—

of Shakespeare. Is not the "চুম্বন" a more romantic way getting the thing than "stealing ?"

[রাজনারায়ণকে লেখা পত্রাংশ, ঐ]

(২৯) (i) "Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst born in 1527 ? This nobleman's play called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote."

[কেশব গাঙ্গুলীকে লেখা পত্রাংশ, ঐ]

(ii) "The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me of King Henry IV and I say to him, 'Harry, the wish was the father of thought'."

[গৌরদাসকে ভার্সাই থেকে লেখা পত্রাংশ, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৬৪]

(৩০) "ভ্রান্তিবিলাস", 'কমেডী অফ্ এরাস'-এর কাহিনী অনুসৃতি, ১৮৬৯ সাল।

(৩১) "Macbeth", 5/5.

—ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
মধুস্মৃতি —নগেন্দ্রনাথ সোম
মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা —শশাঙ্কমোহন সেন
শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী
মধুসূদন গ্রন্থাবলী [বাংলা]
মধুসূদনের অ-সংকলিত ইংরাজী রচনা এবং গ্রন্থসমূহ ॥

হ্যামলেট যুগে যুগে

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহাকবি সেক্সপীয়ার রচিত হ্যামলেট ইংলণ্ডের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হবার পর থেকে আর কোন নাটক সম্ভবতঃ এতবার অভিনীত হয়নি। কিন্তু একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে যে হ্যামলেট অভিনীত হয়েছে তা আজকে যে হ্যামলেট নাটক আমরা পড়ি তারই অনুরূপ। একথা বলা অন্যায় হবে না যে, পরিপূর্ণভাবে সেক্সপীয়ার রচিত হ্যামলেট নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে অভিনীত হয়নি। সেক্সপীয়ারের জীবদ্দশায় কিভাবে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল সে খবর আজও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী হ্যামলেট নাটককে নিজের মনের মত করে নিয়ে অভিনয় করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হ্যামলেট নামে যে নাটক অভিনীত হয়েছে তা পুরোপুরি সেক্সপীয়ার রচিত হ্যামলেট নাটক নয়। হ্যামলেট নাটকের বিভিন্ন অভিনয়-রীতি এবং বিভিন্ন প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের কীর্তিকলাপ এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

সেক্সপীয়ার রচিত হ্যামলেট নাটকের প্রথম অভিনয় ১৬০০ বা ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে হয়, একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলা বাহুল্য। এই স্বীকৃতির মানে এই নয় যে, ঐ তারিখ নিয়ে বিবাদ শেষ হয়েছে। বরঞ্চ জ্ঞানী-জনদের মধ্যে হ্যামলেট রচনার এবং তার প্রথম অভিনয়ের তারিখ নিয়ে তীব্র বিতণ্ডা শতাব্দীকাল থেকে চলে আসছে। এই সূত্রে ওথেলা নাটকের কাল এবং রচনার পরিপক্কতা নিয়ে যে গবেষণা চলেছে তা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে একাধারে যেমন শ্রদ্ধার বস্তু তেমনি হাস্যকর। বিভিন্ন গবেষকের কুটিল দৃষ্টিতে একই রচনা কিভাবে বিভিন্নরূপে বিচারিত হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর।

আমাদের একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, সেক্সপীয়ারের সহ-যোগিতায় হ্যামলেট নাটক গ্লোব থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। রিচার্ড

যুবরাজ পরিচালনা ও হ্যামলেট চরিত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট পুনরভিনীত হয় রাণী এলিজাবেথ এবং প্যালাটিনের ইলেকটারের সম্মুখে। লর্ড ট্রেসারারের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারি যে, ক্রমান্বয়ে চৌদ্দটি নাটক পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে হ্যামলেট, ওথেলো ও কিং লিয়ার অন্যতম। এই নাটকগুলি প্রযোজনার জন্য জন হেমিংকে তিরানব্বই পাউণ্ড ছয় শিলিং আট পেন্স দেওয়া হয়। এই সময়ের পর থেকে হ্যামলেট নাটক প্রায় নিয়মিতভাবে ইংলণ্ডে অভিনীত হতে থাকে। বিশেষভাবে যে ঘটনা চোখে পড়ে তা হচ্ছে একমাত্র হ্যামলেট ছাড়া সেক্সপীয়ারের কোন নাটক ১৬১০ থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত অভিনীত হয়নি। ইংলণ্ডের প্রত্যেক সময়ের শ্রেষ্ঠ নটরা এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আনথ্রোপোপেগস' নামে নৃতত্ত্ব বিষয়ক এক বিরাট বই প্রকাশিত হয়। তার ১৪ পৃষ্ঠায় নরখাদকদের বিবরণীতে অন্যান্য কথার শেষে লেখা আছে, "অনেকটা হ্যামলেটের ভূতের মত"। সুতরাং 'হ্যামলেটের ভূত' ১৬২৪ এর মধ্যে প্রচলিত প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বোঝা যায়। নাবিকদের ডায়েরী ছাড়া ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্যামলেট অভিনয়ের অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে নাবিকদের বিবরণ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে এটি জনপ্রিয় নাটকের অন্যতম ছিল।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাজ্ঞবর স্যামুয়েল পেপি হ্যামলেটের ভূমিকায় বেটারটনের অভিনয় দেখে নাটকের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। পরে এই ভূমিকায় টেলার গ্রহণ করেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও বেটারটন কখনও টেলার হ্যামলেটের রূপারোপ করতেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হিষ্টোরিয়া হিষ্টানিকা গ্রন্থে টেলারের অভিনয়ের ভীষণ প্রশংসা করা হয়েছে। বেটারটন কিন্তু ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভূমিকাভিনয় করা ছাড়েননি। ৭০ বছর বয়সে বেটারটনকে দেখে সাংবাদিক এণ্টনি এ্যাসটন বলেছেন যে, তখন যদিও তাঁকে ঐ চরিত্রে মানাত না তবু অভিনয় দেখলে তিনিই যে হ্যামলেট এ বিষয়ে সন্দেহও থাকত না।

বেটারটনের মৃত্যুর পর বিখ্যাত গ্যারিক এই চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় সিন আঁকার শিল্প সমধিক উন্নত হল। গ্যারিক তার পূর্ণ সুযোগ নিলেন। কাল জামা আর ডান পায়ের মোজা খোলা অবস্থায় গ্যারিক যে হ্যামলেটের সৃষ্টি করলেন তা এখন পর্যন্ত চলেছে।

আজ অঙ্গে কাল রঙের জামা ছাড়া হ্যামলেট চরিত্র কেউ কল্পনা করতে পারেন না। ডান পায়ের মোজা খোলা রাখার ফ্যাশন, গত দশকের (১৯৫০-৬০) অতি আধুনিকরা মাত্র সেদিন বন্ধ করতে পেরেছেন। গ্যারিকের হ্যামলেট চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় হয় ১৭৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তেরবার তাঁকে এই চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। গ্যারিকের সমসাময়িকদের মধ্যে উইলক্স্, ডেলানে, সিবার ও রায়ান এই চরিত্রে অভিনয় করেন। সেই সময়কার বড় অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র কুইন কখনও এই ভূমিকা গ্রহণ করেননি। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেরিডান প্রথম এই চরিত্রে অভিনয় করলেও ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয়বার হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য গ্যারিককে তিনশো পাউণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই গ্যারিকের ভাগ্যরবি রাহুগ্রস্ত হয়—এবং হ্যামলেটের ভূমিকায় ব্যারী সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। ড্রুরিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে গ্যারিক এই থিয়েটারের পরিধি বৃদ্ধি করলেন এবং ১৭৬২-৬৩তে আবার হ্যামলেট অভিনয় করলেন। ব্যারীর সাফল্যের পর রাতারাতি অভিনেতা হয়ে যাবার মোহে বহু লোক হ্যামলেটের অভিনয় করতে সুরু করলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাওএল এবং হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ড সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর সুন্দর চেহারার জন্য অনুরাগিণীর অভাব ছিল না। কোন কিছু হল্যাণ্ডের হাত থেকে পড়ে গেলেই এই অনুরাগিণীর দল দৌড়ে স্টেজে উঠে সেটি তুলে দিতেন। অভিনয় এমনিতেই অসম্ভব হয়ে উঠল। তারপর যেদিন দুটি সুন্দরীর প্রেম-প্রতিযোগিতা মঞ্চের ওপর মল্লযুদ্ধে প্রকাশ পেল সেদিন অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল।

গ্যারিক হ্যামলেট নাটকটিকে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তেমনি তার ক্ষতিও করেছিলেন। কোন এক তরল মুহূর্তে তাঁর সেক্সপীয়ারের ওপর কলম চালাতে ইচ্ছা হয়। সেই নয়া হ্যামলেটের অভিনয় কেউ না করলেও হ্যামলেট নাটককে ভাল করার চেষ্টা গ্যারিকের পরিশ্রমেই সুরু হল এবং ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত নানারকমের হ্যামলেটের দেখা পাই। কখন তার মা নাই, কখন বন্ধু নাই, কখন বাপ নাই। একজন নাট্যকার তো ফরটিনব্রাসকে নায়ক ও হ্যামলেটকে 'ভিলেন' করেও নাটক লিখে ফেললেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হেণ্ডারসন প্রথম অভিনয় করলেন হ্যামলেট চরিত্রে আর ১৭৮০তে জন কেম্বল সেক্সপীয়ারকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন

অর্থাৎ সেক্সপীয়ারের রচনাকে পুরোপুরি তাঁর অভিনয়ে বজায় রাখলেন।

লণ্ডনের থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ যুগ সেই সময় সুরু হল। কেম্বলের পর যে সব অভিনেতারা হ্যামলেটের অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই হ্যামলেট চরিত্রের ওপর তাঁদের নিজস্ব ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু কেম্বলের মত সেক্সপীয়ারের রচনাকে অবিকৃত রাখার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না, যার ফলে তাঁরা প্রত্যেকে হ্যামলেট চরিত্রটিকে নিজের মনের মত করে নিয়েছিলেন। একদিকে বিদ্বান ইযাঙ্গ, প্রতিভাশালী কীন এবং মধুরকণ্ঠ চার্লস কেম্বল যেমন হ্যামলেট চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কিয়ার্ণস এবং হিলিয়ার্ড হোয়াইটের হ্যামলেট চরিত্র গল্প হয়ে আছে। হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করতে করতে কিয়ার্ণস নাটকে সুরের অপ্রাচুর্য খুঁজে পেলেন। সেজন্য হ্যামলেটরূপী কিযার্ণস এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাবার সময় ব্যাগপাইপে একই সময় অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণভাবে দুটি সুরে আলাপ করতেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি স্বয়ং একটি গান রচনা করে সেইটি ওফেলিয়াকে দিয়ে গাওয়াতেন। শ্রীযুক্ত হোয়াইট হ্যামলেটকে চাষারূপে রূপারোপ করলেন এবং হ্যামলেট নাটক যে বিশেষ করে চাষাদের নাটক এইটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হ্যামলেট নাটকের স্বাভাবিক অভিনয় চলা সত্ত্বেও একদল লোক মনে করতে লাগলেন যে হ্যামলেট আসলে একটি কমিক নাটক এবং সেটিকে সেইভাবেই প্রযোজনা করা উচিত। তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা নানারকমের কমিক হ্যামলেটের খবর জানতে পারি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খ্যাতনামা অভিনেতৃগণও এই কমিক হ্যামলেটের রূপারোপ করেছেন। জনপ্রিয় অভিনেতার অভিনয়কে ব্যঙ্গ করবার জন্যও অনেক সময় কমিক রীতিতে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হয়েছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেও এই কমিক হ্যামলেট অভিনয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। আমেরিকার বিলি ব্রায়াণ্ট এই সময় দীর্ঘদিন যাবত হ্যামলেট নাটকের অভিনয় করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি হ্যামলেট নাটকে যথেষ্ট চরিত্রের অভাব অনুভব করে ম্যাকবেথ নাটকের ডাইনীদের এবং মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস থেকে সাইলককে ধার নিয়েছিলেন। পাছে এত চেষ্টা করেও জনপ্রিয়তা কম হয়, তাই তিনি প্রচলিত সমকালীন গল্পের জনপ্রিয় কিছু চরিত্র (যেমন—ব্যাটম্যান, ফ্যানটম্ ইত্যাদি) সংযোজনা

করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে, হাসি এবং ভয়াবহতাকে ক্রমান্বয়ে প্রতি দৃশ্যে বাড়িয়ে দিয়ে ব্রায়াণ্ট এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন এবং সেই আবহাওয়াকে অনুভব করবার জন্য দর্শকগণ বারবার এই অভিনয় দেখতে যেতেন।

যাঁরা স্যার হেনরি আরভিং-এর সঙ্গে জর্জ বার্ণাড শ'র দীর্ঘদিনের মনোমালিন্যের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে আরভিং-এর সঙ্গে শ-এর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে। হ্যামলেট চরিত্রটিকে নিজের মনে প্রক্ষেপণের জন্য আরভিং নাটক থেকে অনেকগুলি প্রযোজনীয় অংশ বাদ দিয়ে দিতেন। শ' সমালোচনা করেছিলেন যে আরভিং হ্যামলেট চরিত্রের রূপায়ণ করতে পারেননি, হ্যামলেটকে জোর করে আরভিং চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। সুতরাং আরভিং-এর অভিনয় পর্যন্ত সেক্সপীয়ারের নাটক তার নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা বলা যায় না।

কেবলমাত্র খ্যাতনামা অভিনেতারাই নন, বালক-বালিকাগণ এবং অভিনেত্রীগণও হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেনরি চার্লস বেটি মাত্র ১২ বছর বয়সে ড্রুরিলেন থিয়েটারে হ্যামলেট ভূমিকায় অভিনয় করে সমস্ত ইংলণ্ডকে মাতাল করে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ১২ বছর বয়স্ক এই অভিনেতার অভিনয়ে এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে গ্যারিকের সমকক্ষ অভিনেতা বলতে দ্বিধা করেননি। সমালোচকগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। দু'একজন সমালোচক বেটির অভিনয়ে ত্রুটি ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। সেকথা জানামাত্র তাঁদের ওপর জনসাধারণ হামলা করতে দ্বিধা করেনি। বেটির জনপ্রিয়তা কি প্রচণ্ড পাগলামির পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল তা আমরা জানতে পারি যখন দেখি ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট স্বয়ং বেটির অভিনয় দেখতে যাবার জন্য পার্লামেণ্ট মুলতুবী করার প্রস্তাব করেছেন! ইংলণ্ডের যুবরাজ কার্লটন হাউসে বেটিকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করে অত্যন্ত কৃতার্থবোধ করেছেন। ১৫ বছর বয়সে প্রচুর অর্থ এবং সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বেটি প্রবীণ অভিনেতার সম্মানে সম্মানিত

হলেন। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেটি অভিনয় করেছিলেন। তারপর শ্রীমান্ বেটি ৮৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও জীবনে আর কখনও অভিনয় করেননি। বেটির অভিনয়ের ধারা ধরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ স্মিথ ৮ বছর বয়সে এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পেইন ১৭ বছর বয়সে হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী শ্রীমান্ জোসেফ বার্ক মাত্র ৭ বছর বয়সে সাইলক, রিচার্ড দি থার্ড এবং হ্যামলেট চরিত্রে প্রথম রূপারোপ করেছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে এই চরিত্রগুলিতে ইনি অভিনয় করেন এবং দৃশ্যান্তরের অবসরে হাসির গান করে এবং একক বেহালা বাজিয়ে দর্শকদের মোহিত করে রাখেন। পরিণত বয়সে বেহালা বাজিয়ে হিসেবে তাঁর কিছু খ্যাতিলাভ হলেও অভিনেতা হিসেবে তাঁকে আর দেখা যায়নি।

বেটির পরে যেসব বালক অভিনেতা হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর কেউই যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লারা ফিসার নামে একটি বালিকা অভিনয় প্রতিভায় এবং জনপ্রিয়তায় বেটির সমকক্ষ হয়েছিলেন বলা চলে। মাত্র ৬ বছর বয়সে ক্লারা নিয়মিত ড্রুরিলেন থিয়েটারে সাইলক ও জুলিয়েটের ভূমিকাভিনয় করতে সুরু করেন। পরিণত বয়সের আগে অর্থাৎ ১৭ বছর বয়স হবার আগে তিনি হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেননি। কিন্তু সেই অভিনয়ের জনপ্রিয়তা সম্ভবতঃ বেটিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং ম্যাক্রু বীরভোম পর্যন্ত তাঁকে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্লারার জনপ্রিয়তায় হোটেল, রেসের ঘোড়া, জাহাজ, মদ এবং দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের উত্তরাধিকারীর নাম ক্লারা রাখা হবে কিনা তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনার সংবাদ পাওয়া যায়। অপরিণত বয়স্ক অভিনেত্রীদের মধ্যে একমাত্র ক্লারাই তাঁর এই জনপ্রিয়তাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পেরেছিলেন এবং দীর্ঘকাল নাটক অভিনয় করে জনসাধারণকে আনন্দ দিয়েছিলেন।

হ্যামলেট চরিত্রে রূপায়িত মহিলা অভিনেত্রীরাও পেছিয়ে থাকেননি। বিখ্যাত সিডন বংশের সারা সিডন ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট চরিত্রে রূপ দেন। ড্রুরিলেন থিয়েটারে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জেন পাওয়েল প্রথম লণ্ডনের

দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। মিসেস বার্টলি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাতে প্রথম মহিলা হ্যামলেটের সম্মানে ভূষিত হলেন। এই বছরই মার্চ মাসে তিনি ইংলণ্ডে হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ার গ্লোভার লণ্ডনে হ্যামলেট ভূমিকা অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এডমণ্ড কীন স্বয়ং তাঁর এই নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী ব্যাণ্ডম্যান-পামার হ্যামলেট চরিত্রে ১০০ রাত্রির বেশী অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। এঁরা ছাড়া ১৭৮০তে মিসেস ইঞ্চবোল্ড, ১৮:৯এ মিসেস বার্ণেস, ১৮৩৯এ মিসেস শ' ও মিসেস ক্রহ্যাম এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। শ্রীমতী শার্লট ক্যুসম্যান ও শ্রীমতী মারিয়ট যেদিন হ্যামলেট চরিত্রে মঞ্চে নেমেছিলেন সেদিনকার আবহাওয়া কল্পনা করা কঠিন নয়।

কিন্তু এই চরিত্রে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যলাভ করেছেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী সারা বের্ণহার্ট। সেদিনকার অভিনয় দেখেছিলেন এমন একজন দর্শক আজও বেঁচে আছেন—তিনি হলেন এলেনটেরির পুত্র বিখ্যাত গর্ডন ক্রেগ। তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিনয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, চালচলনে নারীসুলভ কোমলতাকে সম্পূর্ণ ঢাকতে না পারলেও বাচনে এবং অভিনয়ে যে অজাতশত্রু ডেন রাজকুমারকে তিনি সৃষ্টি করলেন, অভিনয়ের শেষে তার জন্য চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী এসমে বেরিঞ্জার ৬৪ বছর বয়সে হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করে আলোচনার তরঙ্গ তুলেছিলেন। সর্বশেষ মহিলা হ্যামলেট আমরা দেখেছি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিওভান ম্যাক্কেনা এই চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের দর্শকদের দীর্ঘদিন পর চমকে দিয়েছিলেন। কারণ তখন হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করা অভিনয় জীবনের সম্মান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেচার হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। তখন থেকেই হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় প্রত্যেক বৃটিশ অভিনেতার সম্মানের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল। গত একশ বছরের মধ্যে এমন একজন অভিনেতাও দেখা যাবে না যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কৃতিত্ব

দাবী করেছেন অথচ হ্যামলেট চরিত্রে অভিনয় করেননি। ম্যাকরেডি ও ব্যারী সালিভান (১৮৫২) চার্লস কীন (১৮৫৮) হেনরি আরভিং (১৮৭৪) ফরবেশ রবার্টসন (১৮৯৭) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। ফরবেশ রবার্টসন আরভিংএর জীবদ্দশাতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হ্যামলেট সৃষ্টি করলেন। তাঁর হ্যামলেট অরেভিংএর মত শান্ত. বিজ্ঞ, ধীরস্থির নয়—সে উদ্দাম, অসংযত। তার তারুণ্য তার চিন্তার খাঁচায় ডানা ঝাপটিয়ে মরে গেল, সে শব্দ তিনি দর্শকদের শোনাতে পেরেছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট নাটক প্রথম সিনেমায় রূপায়িত হল এবং ফরবেশ রবার্টসন হ্যামলেট চরিত্রে রূপারোপ করলেন। এই সময় থেকেই হ্যামলেট অভিনয়ের আধুনিক যুগ সুরু হল বলা যেতে পারে।

•

আধুনিক যুগে হ্যামলেট নাটকের অভিনয় করে যারা অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন—স্ট্যাক (১৯১৬), থর্ণডাইক (১৯১৮), হোয়ার বারটন (১৯২০), মিলটন (১৯২৩), হলোওয়ে (১৯২৭), জন গিলগুড (১৯৩০ ও ৩৪), রবার্ট হ্যারিস (১৯৩২), ডনাল্ড উলফিট (১৯৩৬), লরেন্স অলিভিয়ার (১৯৩৭), এ্যালেক গিনেস (১৯৩৯), রবার্ট হেলপ্‌ম্যান (১৯৪৪), মাইকেল রেডগ্রেভ (১৯৫০), বিচার্ড বারটন (১৯৫৩), এ্যালেন বেডেল (১৯৫৯), পল স্কোফিল্ড (১৯৬০), আইয়ান বানেন (১৯৬১), পিটার ও'টুল (১৯৬৩) ও রিচার্ড বারটন (১৯৬৪)।

এক নাগারে অভিনয় চলাকে যদি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের মান বলে ধরা যায় তাহলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি আরভিংএর ২১১ রাত্রির পর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন গিলগুডের ১৫৭ রাত্রি সর্বাপেক্ষা লম্বা হ্যামলেট অভিনয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলেট দ্বিতীয়বার সিনেমায় রূপান্তরিত হয়। পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় লরেন্স অলিভিয়ারের অপূর্ব অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রাখার মত। এ ছাড়া জাপানে, পোল্যাণ্ডে ও জার্মাণীতে হ্যামলেট সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। হ্যামলেট এমন একখানি নাটক যা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বার বার অভিনয় হয়েছে। আমেরিকার রৌদ্রোজ্জ্বল পশ্চিম প্রান্ত থেকে উজবেকিস্থান, মস্কোর শীতের রাত্রি থেকে স্পেনের উত্তপ্ত সন্ধ্যায়, উত্তর নরওয়ের মধ্যরাত্রির সূর্য থেকে ইটালীয় সন্ধ্যার চন্দ্রের স্নিগ্ধতা এই অভিনয়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। পূর্বাঞ্চলের দেশগুলি?

মধ্যে জাপান ও ভারতবর্ষে এবং সুদূর অষ্ট্রেলিয়াতে বার বার হ্যামলেট নাটকের অভিনয় হয়েছে।

আজকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডগুলিতে এমন কোন খ্যাতিমান অভিনেতা নেই যিনি জীবনে অন্তত: একবার এই ভূমিকায় অভিনয় করেননি। এমন খ্যাতিমান প্রযোজক দুর্লভ যিনি এই নাটকের প্রযোজনা করেননি। এছাড়া, রেডিও, টেলিভিশন ও রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ্যামলেট অথবা তার অংশবিশেষ অগণিতবার অভিনীত হয়েছে।

সবশেষে তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, মহাকবির স্মৃতিরক্ষার জন্য কারও ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। তাঁর কীর্তিরথ সগৌরবে চলেছে সমস্ত গণ্ডীকে অস্বীকার ক'রে। চারশ' বছর পূর্ণ হল, আজও তাঁর নাটক, বিশেষ করে হ্যামলেট, চার শতাব্দীর নাটককে উপেক্ষা করে পুরোধায় রয়েছে। জীবনমৃত্যুর নাটক হ্যামলেট মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অমরতা পেয়েছে।

গল্প

ভাঙ্গা নৌকার মাঝি

সৌরি ঘটক

একদিন ভাদ্র মাসের দুপুর রাত। কদিন ধরে আকাশে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। অসহ্য গুমোটে আনচান করছে শরীর। মাকালতোল গ্রামে নিজের মাটির ঘরে—খাজুর পাতার তলাই এর ওপর কাঁথা বেছান বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে এক দম্পতি—আতর আলি আর সাকিনা।

ছোট্ট অন্ধকার ঘরে মশার ঝাঁক মৌমাছির চাকের মত ভন্‌ভন্‌ করছে। সাকিনার পাশে অঘোরে ঘুমুচ্ছে তাদের তিনটি ছেলে মেয়ে। ঘুমের ঘোরেই ওরা মশার কামড়ে ওঁ আঁ করে কাতরে উঠছে বারবার। সাকিনা শুয়ে শুয়েই নিজের আঁচল দিয়ে বাতাস করে মশাগুলোকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কখনও বা গভীর দরদ দিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তাদের গায়ে। আর আতর আলি অবিরাম দু হাতে করে নিজের সারা দেহ চাপড়াচ্ছে আর উঃ আঃ করে ছটফট করছে।

আতর আলি এই গাঁয়ের একজন গরীব চাষী। নিজের একটা এঁড়ে বাছুর আছে। তার ওপর ভরসা করে আর একজন গরীব চাষীর সঙ্গে মিলে জমি ভাগে নিয়েছে বিঘে চারেক। তার ভেতর বিঘে তিনেক আমন আর বিঘেটাক আউশ। চাষ সারা হয়ে গিয়েছে শ্রাবণ মাসে। ধান উঠতে এখনও দু' মাস বাকি। চাষের সময় দু একমণ ধান ধার পেয়েছিল। কিন্তু এখন চাষের পর দারুণ অভাব সুরু হয়েছে সংসারে। ফসলের অবস্থা না দেখে আর কেউ ধান ধার দিতে রাজী নয়। পেটের দায়ে আতর আলি এঁড়েটা বিক্রি করে দিয়েছে। ঘরের পোষা ছাগল দুটোও গিয়েছে। গোটা কতক মুরগীও দিতে হয়েছে কম দামে। এখন সম্বল ঠেকেছে খান তিন-চার পুরোনো ভাঙ্গাচোরা বাসন। কিন্তু সেগুলো বাঁধা দিয়ে আর কদিন চলবে।

এই সব ভাবনায় ঘুম আসে নি তার চোখে। প্রতি বছরই চাষের পর এই দুটো মাস বড় কষ্টে কাটে গরীবদের। মাঘ মাসে ধান ওঠে, খাটনিও মেলে তখন—তারই ঠেসে ফাল্গুন-চৈত্র মাসটা চলে যায়। গ্রীষ্মকালে চাষের কাজ না থাকলেও গেরস্থ বাড়ির ঘর ছাওয়া, আখ ছেঁচা, পাঁচির দেওয়ার

কাজ মেলে টুকটাক। কিন্তু এই চাষের পর না পাওয়া যায় ধার, না মেলে কোন কাজ। এক একটা দিন পার করা যেন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

সাকিনাও গরীবের মেয়ে, গরীবের বৌ। সেও শুয়ে শুয়ে ভাবছে সামনের দিনগুলোর কথা। আতর আলির চেয়ে তার ভাবনা আরও বেশি। কেননা ও হল বেটাছেলে। দু চার দণ্ড বাইরে বেরিয়ে বাঁচবে। কিন্তু তাকে থাকতে হবে বাড়ির ভেতর। প্রতিনিয়ত এই অভুক্ত ছেলেমেয়েগুলো তাকেই ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু উপায়ই বা কি এর! এর জন্যে ত স্বামী দায়ী নয়। আল্লা যাদের গরীব করেছে তাদের সবারই এই এক দশা। তবু এই অবস্থায় যতটুকু পারে স্বামীকে সাহায্য করার চেষ্টা করে সে। নিজের সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটনির পরও পাড়ার বড়লোক মিঞাদের বাড়ি কোনদিন ঘর নিকোয়, কোনদিন বাসন মাজে কি কাপড় কাচে। তাতে যা দুচার গণ্ডা পয়সা, কি এক সানকি ভাত, কি বাসি তরিতরকারি পায়, নিয়ে আসে ঘরে। কিন্তু সে সব ত নিয়মিত মেলে না। তার মত অনেক গরীব কৃপাপ্রার্থী ওদের দুয়োরে। তবু ওরই ভেতর যতটা পারে এনে দেয় ছেলেদের মুখে।

কিন্তু এর ওপর ভরসা করে ত দিন চলবে না। আজ তিন চার দিন থেকেই যা রাঁধছে তাতে ভাল করে পেট ভরছে না কারও। ছেলেগুলো ঘ্যান ঘ্যান করছে দিনরাত। তবু এখনও চেয়েচিন্তে মিলছে দু এক সের চাল। 'ও বেলা দেব'—বলে ধারও মিলছে দোকানে। কিন্তু এমন করে আর কটা দিনই বা চলবে! তারপর ছেলেপিলের হাত ধরে গোটা গোটা উপোস।

"মণ তিনেক ধান হলেই এ দুটো মাস চলে যেত কোন রকমে"—উসখুস করতে করতে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে আসে সাকিনার মুখ দিয়ে। যেন মনের চিন্তাটাই ছিটকে আসে বাইরে। বলে, "দু মণ চাল হত তাহলে! দশ সের মুড়ির আর দেড়মণ ভাতের। আমরা না খেলে ঐ মুড়িতেই চলে যেত ছেলে কটার। আর বাকিটায় যা-হোক করে দুমুঠো হয়ে যেত দুবেলা।"

কিন্তু কথাটা তার ভাল করে শেষ করা হয় না। তার আগেই নিজের পিঠের ওপর অদৃশ্য মশাকে সশব্দে একটা চাপড় মেরে আতর আলি রুক্ষ গলায় ঝেঁঝে ওঠে, "আরে, ধেৎ মাগী! কানের গোড়ায় বিড়বিড় করে রাত দুপুরে। তিন ছটাক ধান মেলাতে পারছি না ত তিন মণ!"

স্বামীর তাড়া খেয়ে সাকিনা চুপ করে যায়। উল্টোদিকে পাশ ফিরে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ হাত বোলায় ছেলেদের গায়ে। তারপর আবার সোজা

হয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে বলে, "বড় মিঞা চড়া দাম পেয়ে ধানকটা সব ছেড়ে দিল। গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের মুখের দিকে তাকালও না একবার। নইলে—"

"নইলে তোকে ধান দিত বড় মিঞা" – আবার ঝেঁঝে ওঠে আতর আলি।

সাকিনা মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলে, "দেয় ত !"

"সে যাদের জমি আছে। কম দামে লিখে দিলে তবে! আমাদের কি আছে যে দেবে ?"

"ধরা পাড়া করলে কি দিত না চাট্টি। সেবার ত দিয়েছিল দু মণ"

"আরে এ মাগী ত আচ্ছা বোকা বটে। সেবার ওর বাড়ি মুনিষ ছিলাম না আমি" অবুঝের মত কথা বলায় আবার ধমক দেয় আতর আলি।

এ সব কথা শুনতে এখন তার ভাল লাগছে না। একই কথা—সে নিজেও যা ভাবছে অন্যের কাছে তাই শুনে কি লাভ! কিছু কি সমাধান হবে তাতে। তারচেয়ে নীরবে চারদণ্ড ভাবলে হয়ত কোন উপায় বেরুবে। তাই সাকিনা এ সব কথা বললেই তার মেজাজটা চড়ে উঠছে।

সাকিনার কিন্তু অভিমান নেই তাতে। সে শুধু থাকতে পারছে না চুপ করে। তার ইচ্ছে দুটো কথা হোক। দুঃখ ত আছেই। কিন্তু তবু তা নিয়ে দুদণ্ড বলাকওয়া করলে মনটা অনেক হালকা হয়। অনেকখানি নেমে যায় বুকের ভারটা। নইলে সে মেয়েমানুষ, একা একা অত ভাবতে পারে না দিনরাত। তাই দু দুবার তাড়া খেয়েও সে আবার ফিসফিস করে বলে ওঠে, "আউশ ধান ক মণ হবে আমাদের —"

"যদি বানবন্যে কি কোন টানটোন না পায় ত মণ আষ্টেক হবে। পঁচিশ কাঠা ভুঁই ত বটে—" এবার শান্ত হয়ে জবাব দিল আতর আলি।

"তা হলে চার মণ আমরা ভাগে পাব" —আপনমনে গুনগুন করে হিসেব করে চলল সাকিনা -"আড়াই মণের চাট্টি বেশিই চাল হবে। তার ভেতর আবার মতেহাবের মায়ের কাছে ধার খাওয়া হয়ে গেল দশ কাঠার ওপর। যাক সেটা শোধ দিয়েও টেনেটুনে চলে যাবে পোষ মাস পর্যন্ত— "।

"বিচতে হবে না একমণ ধান —" সাকিনার হিসাবের মাঝখানে তাড়াতাড়ি বাধা দেয় আতর আলি। যেন এখুনি চাল করে ফেলল সাকিনা। ধান রইল জমিতে—এই ছোট্ট ঘরের অনেক দূরে—বিরাট মাঠের এক প্রান্তে —কাদা জলের ওপর সে এখন শুধু কচি কচি পাতার ঝাড়। ভবিষ্যতে সে পেকে এই উঠোন পর্যন্ত আসবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু

তবু মনে মনে হলেও সাকিনাকে বেহিসাবির মত সব ধানের চাল করতে দেবে কেন আতর আলি ?

স্বামীর কথায় নিজের ত্রুটি শুধরে নেয় সাকিনা। সত্যিই ত। সব ধানের ত চাল করা চলবে না। তাড়াতাড়ি হিসেবটা সামলে নিয়ে বলে, "হ্যাঁ বিচতে ত হবেই। পরনের শাড়িখানা একেবারে তেনা হয়ে গিয়েছে।"

আতর আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "ও কাপড় চোপড় হবে না এখন। ধান বিচে আলুর বীজ খৈল আনতে হবে। কাপড় হতে সেই মাঘ মাস।"

"আমি কি পড়ে বেরুব বাড়ি থেকে ? সরম লাগে না ছেঁড়া তেনা পরে এবাড়ি ওবাড়ি যেতে " স্বামীর কথায় মৃদু আপত্তি জানায় সাকিনা।

কিন্তু আতর আলি একেবারেই গ্রাহ্য করে না সেটা। বলে, "সরম আবার কি ? মিঞের বিবির কাছে পুরোনোধুরোনো একখান চেয়ে নিয়ে চালা এই তিনটে মাস।"

"ধেৎ !" স্বামীর কথা একেবারেই পছন্দ হয় না সাকিনার। মুখ ঘুরিয়ে সে বলে, "কত চাইব। এই ত সেদিন ছোট ছেলেটার একটা পিরান চেয়ে নিলাম।"

আতর আলি বলে, "তাতে হয়েছে কি ! যাহোক করে কাটাতে ত হবে দিন কটা। নইলে টাকাটা পাব কোথায়। যদি দর না পড়ে যায় ত একমণ ধান বিচে হবে বারটা টাকা। তার ভেতর আলুর বীজ খইল কিনতেই হবে মুদিকেও দিতে হবে তিনটে টাকা। নইলে কোনদিন তেলনুন দেওয়া বন্ধ করে দেবে। এধারে কান্তি ঘোষের টাকাটা ত পড়েই রইল। আচ্ছা, কান্তি ঘোষ বাড়িতে এসেছিল নাকি তাগাদা করতে -" ভবিষ্যতের ভাবনা থেকে বাস্তবে নেমে এল আতর আলি।

"কাল বিকেলে এসেছিল ত।" ওর কথার উত্তরে সাকিনা জবাব দিল আস্তে আস্তে।

"কি বলল ?"

"ছেলেটাকে বলল বাপ এলে দেখা করতে বলিস।"

"হুঁ !" একটু দম ধরে চুপ করে থাকে আতর আলি। তারপর বলে, "ছেলেদের বলে দিস যেন এলেই বলে বাপ বাড়িতে নেই। শালা হারামী ভারি বেহুদা। টাকার জন্যে হয়ত কোনদিন অপমান করে বসবে।"

"কিন্তু গাঁয়ে যদি দেখা হয়-- "

"দেখা হয়ে যায় ত কি করব। ও পাড়া দিয়ে যাব না এ কদিন—"

কথাটা বেশ মনঃপূত হয় না সাকিনার। একটু বিরক্ত হয়ে সে বলে, "কি দরকার ওসব লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করার!"

"এখন ত বলছিস! কিন্তু অসময়ে পাই কোথায়। এই ধান কটা উঠলেই ওর টাকাটা আগে ফেলে দেব।"

আষাঢ় মাসে তিন দিন বাদল হয়েছিল একটানা। সে দুর্যোগে আর কোথাও জোটাতে না পেরে ধার নিতে হয়েছিল ওর কাছে। তারপর অভাবের তাড়নায় আর শোধ দিতে পারে নি।

চুপচাপ খানিকটা ভেবে নিয়ে আতর আলি আবার পুরানো কথায় ফিরে আসে। বলে, "ডাক্তারের কাছেও একবার যেতে হবে। নইলে গতবারের মত যদি সর্দি হাঁপানির টান ওঠে ধান ভুঁয়েই পড়ে থাকবে! কাটবে কে?"

"ওষুধ আমাকেও দুদিন খেতে হবে। বুঝলে"– স্বামীর কথার উত্তরে ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে সাকিনা। অবশ্য উপসর্গটা প্রকাশ করে না। কারণ স্বামী হলেও মেয়েরা তাদের সবকথা সবসময় বলতে পারে না নিঃসঙ্কোচে।

কিন্তু আতর আলি যেন শুনতেই পায় না এ কথা। আপন মনে বিড়বিড় করে বলে, "শালা একা মানুষ কোনদিকে যে সামলাই। অবস্থা হয়েছে ছেঁড়া তেনার মত। এধারে ফোঁড় দিলে ওধার ছেঁড়ে—ওধারে দিলে এধার যায়—।"

সাকিনা চুপ করেই থাকে। আতর আলিও থেমে যায় খানিকক্ষণ। নীরবতা নেমে আসে ঘরের ভেতর। বাইরে ছমছম করে গভীর রাত। আকাশে যদিও কদিন ধরে বৃষ্টি নেই তবু চারিপাশের খাল ডোবায় ব্যাঙ ডাকে কোঁ কোঁ করে। কদিন রোদে মাটির ওপরকার কাদা পচে একটা আঁশটে গন্ধ ওঠে চারিধারে। পাশের বাড়ির রোগা বুড়িটা শ্লেষ্মাভরা গলায় খকখক্ করে কাশে। ঘরের চালের ওপর একটা পেঁচা ডাকে হুমহুম করে।

নীরবে পাশাপাশি শুয়ে থাকে স্বামী আর স্ত্রী। কতই বা বয়স হবে দুজনের। সাকিনা বাইশ, আর আতর আলি ত্রিশ। এই বয়সে কোন রাতে চোখের পাতায় যদি ঘুম নাই আসে তাতে ক্ষতি কি? জগৎময় এরই জন্যে ত ছড়ান রয়েছে কত কবিতা, কত গান, কত কাহিনী, কিন্তু সেসব এদের জন্য নয়। বয়সে এরা তরুণ হলেও এই মাটির ঘরের রূঢ় বাস্তব এদের অভিজ্ঞতাকে যেকোন প্রবীণের মতই পরিণত করে দিয়েছে।

আতর আলি আবার কিছুক্ষণ হাত নেড়ে মশা তাড়ায় গা থেকে। তারপর আপনমনেই বলে, "আর আমন ধান উঠলেই বা কি হবে। চাষের সময় যা খেয়ে রেখেছি তা শোধ করতে গেলে ত শুধু কুলোডালা নিয়ে বাড়ি আসতে হবে—"।

স্বামীর এ আক্ষেপ নীরবে শুনে চলে সাকিনা। আতর আলি বলে যায়, "যা পারে করুক। দত্তমশায়কে এবার আর ধান শোধ করব না। তিনমণ নেওয়া আছে, মনটেক দেব। সব দিতে গেলে খাব কি ছেলেপিলে নিয়ে।"

আবার সাকিনা আস্তে আস্তে স্বামীর কথায় অংশ নেয়। ধীরে ধীরে বলে, "দত্তমশায়কে দিয়ে দেওয়াই ভাল। ও মানুষ খারাপ নয়, সময়ে অসময়ে চাইলে দেয়!"

"নারে বাপু না। তুই মেয়ে মানুষ এসব কথা বুঝিস না—" আতর আলি থামিয়ে দেয় সাকিনাকে—"বড় শেখের ধান শোধ না করলে হয়ত শেষপর্যন্ত হাঙ্গামা লাগিয়ে দেবে একটা।" বলে হঠাৎ একটু গুম হয়ে থেকে বলে, "উঁহু! ও শেখ শালা যা পারে করুক। দত্তমশায়কে ধানটা শোধ করে দেব। দিয়ে চোত্ মাসে টাকা ধার নেব তিনকুড়ি। পাইকারের হাতে পায়ে ধরে কিছু বাকি রেখে গরু ত নিতে হবে একটা! নইলে জমিটা ত ছাড়িয়ে নেবে মিঞা—"।

সাকিনা একবার আড়িমুড়ি ছেড়ে হাই তুলে বলে, "তখন তোমায় বারণ করলাম গরুটা বিচতে—"।

"আরে ধেৎ। বারণ ত করলি। বুঝলাম। কিন্তু গরুটা না বিচলে চাষটা উঠত কি করে। কি খেতিস তখন। দিন গেলে পাকা তিনসের চাল লাগে হুশ আছে।"

হুঁশ আছে বৈকি সাকিনার। রোজ তিনসের চাল লাগে তাও জানে, আবার ঘুচে গেলে যে গরু কেনা যে কত শক্ত তাও বোঝে। কিন্তু বুঝে করবে কি। অবস্থাটা হল সেই শীতকালের ছোট্ট লেপের মত। এধার টানলে ওধার ফাঁক হয়ে যায় ওধার টানলে এধার। গোটা দেহটা গরম হয় না কিছুতে।

আতর আলি কথার মাঝখানে হঠাৎ তার দিকে পাশ ফিরে ফিসফিস করে বলে, "তুই এক কাজ করতে পারিস? মিঞে গিন্নীকে বলে কয়ে দেখ না গোটা কতক টাকা যদি ধার দেয়—"।

"বাবা, যে কিপটে মিঞে গিন্নী—" অন্ধকারেই মুখটা বেঁকায় সাকিনা।

আতর আলি সেটা দেখতে পায় না। বলে, "একটু নরম করে নিবি। যখন বসে থাকবে ওর গায়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিবি। ওর চাচীর সঙ্গে গণ্ডগোল,—তাদের একটু নিন্দে বান্দা করবি।"

স্ত্রীকে মানুষের মন নরম করার কৌশল শেখায় আতর আলি। সাকিনা চুপ করে শোনে। ভীষণ রাগ হয় তার মনে মনে। এসব কি সে বোঝে না। দত্ত মশায়, বড় শেখ, মিঞা সাহেব এদের সঙ্গে মিশলেও বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে ত মেশে না আতর আলি। সে কি বুঝবে যে ওরা ঝি চাকরানীকে কত ঘেন্না করে। পাতের দুটো এটো ভাত দেয়—তাও কত গিদের! কি আঁশ কাটা কাটা কথা! একবার শুনলে মনে হয় এ দুয়োর আর জীবনে মাড়াব না।

আতর আলি ভাবে সাকিনা বুঝি শুনছে মন দিয়ে। সে বুঝিয়ে চলে "এই দেখ না কেন এক এক মানুষ এক এক রকমের। হিঁদু পাড়ার মেঝবাবু, তাকে তুমি খোশামোদ করে যা পার নাও। কিন্তু বড়বাবু, তাকে ভুল হোক ঠিক হোক কড়ায়ক্রান্তিতে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। ধর হাজি সাহেব! তাকে গিয়ে বলতে হবে—'মাঠে দেখলাম আপনার ধানই সবচেয়ে ভাল। গাঁয়ের ওপর হয়েছে আপনার গরু জোড়াটা।' আবার ষষ্ঠী মুদিকে—চোখ মুখ রাঙিয়ে দু কথা বললেই ঘাবড়ে যাবে। ভাববে রাতে এসে হয়ত ডাকাতি করে নেবে—।"

গাঁয়ের বেটাছেলেদের এ সব বিশ্লেষণ শুনতে মজা লাগে সাকিনার। জীবনে দু একবার দূর থেকে দেখেছে তাদের। কিন্তু মানুষগুলো সম্পর্কে ভাল করে বলতে পারে ওই—যে মেশে তাদের সঙ্গে। কিন্তু বলতে বলতে সেই আতর আলি মেয়েদের কথায় আসে। বলে, "মিঞের ত পাঁচ বিবি। তাদের এক একজন এক এক রকম—।" অমনি বিরক্ত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে সাকিনা। অন্য পুরুষদের সে যেমন বোঝে না তেমনি অন্য মেয়েদের কি বুঝবে আতর আলি!

ওকে বিছানায় উঠে বসতে দেখে আতর আলিও কথা বন্ধ করে উঠে বসে। বলে, "বাইরে যাবি? চ! তামুক খাই একটু।

খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে দুজনে। থমথম রাত। ওপরে সমুদ্রের মত শান্ত নীল আকাশ। কিন্তু এসব দেখবার খেয়াল নেই কারও।

বাইরে বেরিয়ে সাকিনা সোজা চলে যায় পুকুরের ঘাটে, আর আতর আলি দেওয়ালের গোঁজে টাঙ্গান হুঁকোটা পেড়ে কলকেয় তামাক সেজে মাথা হেঁট করে টানে চুপচাপ।

ঘাট থেকে ফিরে এসে সাকিনা দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে চুপ করে। ঘরের মতই বাইরেও অসহ্য গরম। তেমনি ভনভন করছে মশার ঝাঁক। ভেতরে ছেলেগুলো সমানে কাতরাচ্ছে। সাকিনা চুপ করে বসে হাত বুলোয় নিজের পায়ে আর আতর আলি হুঁসহুঁস করে কালোকালো ধেঁায়া ছাড়ে প্রতিটি টানের সঙ্গে।

দুটি মানুষ নীরবে ভেবে চলে। যেন একখানা ভাঙ্গা নৌকার মাঝি আর দাঁড়ি দুজনে। একজন বারবার নিশানা ঠিক করে নৌকার মুখটা ফেরাচ্ছে আর একজন টানছে প্রাণপণে। কিন্তু ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই সংসার সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ ঠেলে কিছুতেই নৌকা পারে ভেড়াতে পারছে না। দুজনে কত যুক্তি, কত পরামর্শ, সংসারে কে কেমন মানুষ, কার সঙ্গে কি রকম হিসেব করে চলতে হবে, কার কাছে নিতে হবে, কাকে দিতে হবে, কোন কলসীর জল এনে কোথায় ঢাললে দিনটা কেটে যাবে—সবই ঠিক আছে মনে মনে। কিন্তু একটার পর একটা ঢেউএর ধাক্কায় সব হিসেব বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার জন্যে এতটুকু হতাশা নেই এদের মনে। মাটির মানুষ সব, নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানে ঐ মাটিতে ফসল ফলানোর মতই শ্রম আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুঝতে হয় পরিবেশের বিরুদ্ধে। তারপর দুঃখের পরে সুখ, ব্যথার পরে আনন্দ— এই ত জগতের নিয়ম।

আপন মনে তামাক খেতে খেতে আতর আলি বিড়বিড় করে বলে, “ধানও পাওয়া যায়, টাকারও অভাব থাকে না, জমিও মেলে—সবই মিঞা দেয়, শুধু যদি সকিরের মার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষীটা দিয়ে আসি।”

আতর আলির কথা শুনে চমকে ফিরে তাকায় সাকিনা। শান্ত চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি বলে, “কিন্তু সে তো অন্যায় বড় মিঞার।”

“অন্যায় ত বটেই! বিধবা মেয়েমানুষ, নাবালক ছেলে, লোকবল নেই, নইলে কি আর ও জায়গা বড় মিঞা দখল করতে পারত। চিরকাল আমরা দেখে আসছি সকিরের বাপ গরু বেঁধেছে ওখানে—”।

“তবে?”

"সেইজন্যেই ত সাক্ষী দেব না। ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি মাথায় বাজ পড়বে যে তাহলে—"।

স্বামীর কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফেরায় সাকিনা। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুকের ভেতর থেকে। অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় আতর আলিকে। তার নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন। সে যে অন্যায় প্রলোভনকে জয় করেছে তাতে আপনাআপনি ভবে ওঠে বুকটা। মুখ ফিরিয়ে তাকায় সামনের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। ধীরে ধীরে আবার সে নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যায়। শুধু কানে বাজে স্বামীর টুকরোটুকরো কথাগুলো, "বাবুদের খাজুর গাছের বেড়টা এবার বন্দোবস্ত নেব। গতবার মজানের বাপ ত ছ'কুড়ি টাকা লাভ করেছিল। দেখি সকালসকাল ধান কেটে লাগব গুড়ের ব্যবসায়। চারকুড়ি টাকাও যদি হয় ত গরুটার দাম হয়ে যাবে। তাহলে আর দত্তমশায়ের কাছে ধার করতে হবে না।"

অনেক দূর কোথায় যেন সাপে একটা ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে কোঁ কোঁ করে। শব্দটা শুনে সাকিনা চমকে উঠে স্বামীকে বলে, "আমাদের ঘরে একটা গর্ত করেছে ইঁদুরে - বুঝলে—কাল দেখ ত"।

"কোথায়? কোনখানে? দিনে বলিস নি কেন? লম্পটা জ্বাল ত দেখি—।" সাকিনার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোটা একপাশে ঠেসিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো আতর আলি। সাকিনাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলল, "সে আমি গর্তটার মুখে যাঁতা চাপা দিয়ে দিইছি। কাল দিনে বুঁজিয়ে দিও।"

'খেয়াল করিস! এটা ভাদ্দর্ মাস। মাঠের সাপ গাঁয়ে চলে আসে।"

কথা বলতে বলতে দুজনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায়। সাকিনা খিল দিয়ে দেয় দরজায়। চুপচাপ নিজের নিজের বালিশে মাথা দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে তারা। একটু পরে গাঢ় ঘুম এসে নিথর করে দেয় তাদের। শুধু দুজনের সুপ্ত চেতনায় তখনও ঘুরপাক খায়: মেঝ বাবু—বড় মিঞে—পুরোনো শাড়ী—গুড়ের ব্যবসা—কান্তি ঘোষকে এড়িয়ে যেতে হবে—হাজি সাহেবকে তোষামোদ করতে হবে—আর মুদির কাছে চোখমুখ রাঙিয়েই নিতে হবে ধার—যেমন করে হোক বাঁচতে হবে আগামী ফসল ওঠা পর্যন্ত॥

উপনিষদে
'মানবতাবাদ' প্রসঙ্গে

প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীর সময় হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্য, দর্শন ও কাব্যের আলোচনা ও সমালোচনা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে একদল রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শনের সহিত উপনিষদের সম্পর্ক এবং উহার উপর উপনিষদের প্রভাব কতখানি তাহাই নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাহিত্যেই হউক আর বিজ্ঞানেই হউক কোন নূতন মতবাদ বাহির হইলে, সেই সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একটি কৌশল সুবিদিত। প্রথমে তুচ্ছ বলিয়া অগ্রাহ্য করা, দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে গালাগালি ও বিদ্রূপ সমালোচনা, অবশেষে তৃতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হয় নিজেদের সুবিধা মতন মতবাদের সংস্কারসাধন বা শোধন। রবীন্দ্র কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে এখন এই তৃতীয় পর্যায় চলিতেছে। যে-শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী লোকেরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে বলিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম বিরোধী এবং হিন্দু-আদর্শ তিনি উপলব্ধিই করিতে পারেন নাই, সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্তই উপনিষদ হইতে গ্রহণ করা। এমন কি তাঁহার কবিতার বাচনভঙ্গীও উপনিষদের অনুগামী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, মাঘ-চৈত্র '৭০ "চতুষ্কোণে" আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম "উপনিষদে মানবতাদ", কিন্তু

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার 'চতুষ্কোণ'-এর মাঘ-চৈত্র '৭০ সংখ্যায় 'উপনিষদে মানবতাবাদ' নিবন্ধ উপস্থাপন করে এক জটিল তর্ক-সভার সূচনা করেছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ উক্ত নিবন্ধ প্রকাশের পর পাঠক সাধারণের কাছ থেকে মৌখিক ও লিখিত বহু অভিমত ও আলোচনা আমাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলি বাদ দিয়ে, যিনি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর রচনা আমরা দুই সংখ্যায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর পরে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেন। তা হলে বহুলোকের অংশগ্রহণে হয়তো বা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভবপর হবে। —সম্পাদক

প্রবন্ধের ভিতরে তিনি শুধু আলোচনা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত উপনিষদের ব্যাখ্যা। তাহাও আবার সমগ্র উপনিষদের সাধারণ ব্যাখ্যা নয়, ইতস্ততঃ গৃহীত কয়েকটি উপনিষদের বাণীর রবীন্দ্রভাষ্য। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কতকগুলি উক্তি। এই মালমশলা হইতে শ্রীমজুমদার সমগ্র উপনিষদীয় সাহিত্যে মানবতাবাদ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি "প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীদের" উপদেশ দিয়াছেন তাঁহারা যেন উপনিষদ অধ্যয়ন করেন; তাহা হইলে ইহার মধ্যে তাঁহারা এক উদার "মানবতাবাদী দৃষ্টি"র সন্ধান পাইবেন। "সমাজবিজ্ঞানী" বলিতে তিনি কাহাদের বুঝাইয়াছেন তাহা ঠিক স্পষ্ট হয় নাই। তবে 'বিজ্ঞানী' কথাটা যখন যুক্ত আছে, তখন মনে হয় বস্তুবাদী সমাজবিদ্যা যাঁহারা অনুশীলন ও প্রচার করেন তাঁহাদেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ, কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের, কোনও নির্দিষ্ট যুগে, তথাকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি প্রভৃতি বিচার করিয়া তাহাদের সমাজের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং সমাজবিজ্ঞানে মানব সমাজকে যে বিভিন্ন স্তরে সংজ্ঞিত করা হইয়াছে, উক্ত সমাজ তাহার কোন স্তরভুক্ত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা। বাস্তব পরিবেশ এবং আচার-ব্যবহার, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি বাদ দিয়া সমাজের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রচারিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণায় অতি অকিঞ্চিৎকর স্থান অধিকার করিতে পারে। বিশেষতঃ, বর্তমান যুগে যখন দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি এবং সমাজতন্ত্রবাদকে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া সিদ্ধ বিজ্ঞানে উন্নীত হইয়াছে, তখন সেই কোন আদিযুগের ভাববাদী দর্শনের আধ্যাত্মিক বাণী সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা প্রগতিশীল প্রক্রিয়া নহে।

যাহাই হউক, শ্রীমজুমদার বলিতে চাহেন "উপনিষদীয় চিন্তায় অধ্যাত্মবাদী ও রহস্যবাদী দৃষ্টির পাশাপাশি একটি বলিষ্ঠ ইতিবাচক দিক রয়েছে।" ইতিবাচক দিক কাহাকে বলে? অধ্যাত্মবাদী বা রহস্যবাদী দৃষ্টি কি সর্বথাই নেতিবাচক? শ্রীমজুমদাদেরর মতে "এই ইতিবাচক দিকটি হল জগৎস্বীকৃতি"। কোন ধর্মেই জগৎকে সরাসরি অস্বীকার করা হয় না। কারণ ধর্মপ্রবর্তকগণের এবং শ্রীমজুমদার যাহাদের বলিয়াছেন

"ধর্মীয় ভাবধারার প্রবক্তা" তাহাদের, জগৎ এবং জগতের মানুষ লইয়াই কারবার। জগতকে অস্বীকার করিলে জগতের মানুষকেও অস্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ধর্মই বল আর ব্রহ্মবাদই বল, তাহা প্রচার করিবেন কোথায়? কাজেই জগৎস্বীকৃতি, কোনও বড় কথা নহে। দেখিতে হইবে, স্বীকৃতির ধরণ কিরূপ। মায়াবাদী শঙ্করও জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। মায়ার অর্থ nothing নয়। ন্যায় শাস্ত্রে একটি কথা আছে—"বাজীকর তাহার নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারেন না।" জগৎ নাই অথচ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন—ইহা নিজের স্কন্ধে আরোহণ করার মতনই অসম্ভব। বিশপ বার্কলেও † মনের বাহিরে বস্তুর সত্তাকে অস্বীকার করিয়াও বাস্তব (reality) বা অবাস্তবের (fictitious) পার্থক্যের একটা সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করেন।

এই কারণেই, সমস্ত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মতবাদ বা ভাষ্যের মধ্যেই স্ববিরোধী ভাব উপস্থিত হয়, এবং উপনিষদীয় বাণীও তাহার ব্যতিক্রম নয়। উপনিষদের জগৎস্বীকৃতির উদাহরণ হিসাবে বলা হয় "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ"; "জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে।" এই কি জগৎস্বীকৃতি? "ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন" ইহার অর্থ কি? শঙ্করের "মায়ার দ্বারা আবৃত" হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়? জগৎকে তাহার স্বাভাবিক বাস্তব অবস্থায় না দেখিয়া তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয় কিছু আরোপ করিলেই জগৎস্বীকৃতি দোষদুষ্ট হইল এবং সেই রন্ধ্রপথে ধর্মীয় মূঢ়তা ও আধ্যাত্মিক প্রবঞ্চনা প্রবেশ করিবার পথ পায়।

লেখক জগৎস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—"বিশ্বপ্রবাহের মূলগত একটি ঐক্যতত্ত্বে এবং নৈসর্গিক ঘটনার পশ্চাতে নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস" ছিল উপনিষদীয় চিন্তায়। আবার এই ঐক্যতত্ত্বই "মানবতাবাদী দৃষ্টির জন্ম দিয়াছে"।

---

† "Berkeley, refusing as he does, to recognise the existence for distinguishing between the real and the fictitious. * * * * Berkeley tries to connect the notion of reality with the simultaneous perception of the same sensations by many people." [Materialism and Empirio-Criticism—Lenin]

এই বহু বিঘোষিত ঐক্যতত্ত্বটি কি? শ্রীমজুমদার বলিয়াছেন, সর্ব মানবে সমজ্ঞান, ইহাই নাকি উপনিষদীয় মানবতাবাদের মূলমন্ত্র। [অবশ্য মূল উপনিষদগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় কথাটি সর্বমানবে নহে, সর্বজীবে সমজ্ঞান।] কিন্তু এই সমতা বা ঐক্য কোথায়? ঐক্য এইখানে যে সর্বজীবের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক ঐক্য আমাদের লৌকিক সমাজে ঐক্যের সহায়ক হয় নাই। এই ঐক্যবোধ বৈদিক সমাজকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হইতে বাধা দেয় নাই। উপনিষদের ঐক্যের বাণী বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অধিকারী ভেদ, অপরাধীর দণ্ডবিধানে ভেদ, কোনও ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে নাই। উপনিষদ প্রভাবিত ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে যত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, কোনও দেশে কোনকালে তাহা হয় নাই। মানবতাবোধ কতখানি জন্মিয়াছিল তাহা রামায়ণ, মহাভারত, মনু ও পরাশরের সামাজিক আইনকানুন পর্যালোচনা করিলেই অনুধাবন করা যায়। রাম যখন গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন (রাজনৈতিক কৌশলের খাতিরে) তখন তিনি একটি 'বৈপ্লবিক' কার্য করিয়াছেন বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, এরূপ কার্য তখন সমাজে চল ছিল না।

সুতরাং উপনিষদীয় ঐক্যবোধ হইতে মানবতাবাদের জন্ম হইয়াছিল, একথা আদৌ বিশ্বাস্য নহে। কারণ উপনিষদীয় ঐক্য কোন বাস্তব ঐক্যই নয়। এক আধ্যাত্মিক ভাব মাত্র, পরমাত্মার সহিত ঐক্য। বরঞ্চ, ব্রহ্মবাদ প্রতিক্রিয়াশীলদের আপন আধিপত্য বজায় রাখিতে সাহায্যই করিয়াছিল। চণ্ডালের দেহেও ঈশ্বর বাস করেন, তাই বলিয়া কি সে তাহার কুলকর্ম করিবে না; কিংবা সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমান আসন লাভ করিবে? ভগবান যে তাহাকে ঐ কাজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন! এইরূপ যুক্তিবলে বৈদিক সমাজে বা তার পরবর্তীকালের সমাজে, জন্মান্তরবাদই বল আর ব্রহ্মবাদই বল, সবই নিয়োজিত হইয়াছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের, তথা অধিকৃত স্বার্থরক্ষাকারী ব্রাহ্মণদের, প্রতিপত্তি ও সমাজের উচ্চ-নীচ শ্রেণীক্রম বজায় রাখার জন্য। এবং বহু বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত সত্ত্বেও তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য হইয়াছিল। কারণ, জগতের প্রকৃত ঐক্য তাহার জড়-বাস্তবতায় এবং সে ঐক্য প্রমাণিত হয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাধনার ফলে। মেটিরিয়া-

লিজম্ ও এম্পিরিও ক্রিটিসিজমে লেনিন জগতের ঐক্য (the unity of the world) সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এঙ্গেলসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"Engels, in his Anti Duhring, replies to Duhring who had deducted the unity of the world from the unity of thought, as follows : The real unity of the world consists in its materiality, and this is proved not by a few juggling phrases, but by a long and protracted development of philosophy and natural science. ......Engels showed using Duhring as an example, that any philosophy that claims to be consistent can deduce the unity of the world either from thought—in which case it is helpless against spiritualism and fidelism and its arguments became mere phrase juggling—or from the objective reality which exists outside us, which in the theory of knowledge has long gone under the name of matter and which is studied by natural science."

তারপর শ্রীমজুমদার বলিয়াছেন, উপনিষদে নাকি প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে। কিন্তু এই নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁহারা ভাববাদী দৃষ্টি দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী কি? ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা যোগবলে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। গ্রহ নক্ষত্রাদিও সূর্যের অনুগামী। মাঝে মাঝে রাহু দৈত্য আসিয়া সূর্য ও চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। যোগবলে যাহা জানা যায় তাহাই তো আসল সত্য। সেই জন্য বর্তমানের পঞ্জিকাকারেরা 'দৃগ্‌গণিত' ঐক্য মানেন না। চোখে দেখা কি আবার একটা দেখা?

লেখক ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন, মানুষের চেতনাই, ঐ ঐক্য ও নিয়মশৃঙ্খলার আধার। অর্থাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিষয়াশ্রিত বাস্তব জগতের (objective world) মধ্যে নাই, আছে মানুষের চেতনায়। এই কথা বলিতেছেন একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী!! প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, সুতরাং ঐক্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা, আত্মা, বিশ্বাত্মা, সবই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং"—

লেখক অবশ্য বলিয়াছেন,—"সে যুগে মানুষ জগৎপ্রবাহকে দেখত পরস্পর সম্পর্কবিহীন খণ্ডছিন্নভাবে"। তখন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হইল এবং উহার ঐক্যতত্ত্বে, মানবতাবাদী দৃষ্টির উন্মেষ হইল। সর্বভূত ব্রহ্মজালে আচ্ছাদিত করিলেই বুঝি খণ্ডছিন্ন জাগতিক ঘটনা এক নিয়ম পরম্পরায় গ্রথিত হইয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টির জন্ম দেয়? উপনিষদে কোথাও কি সুসমঞ্জস cosmology ব্যাখ্যাত হইয়াছে? দেখা যাউক সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নিয়মের কি তত্ত্ব আমরা উপনিষদ হইতে পাই:

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" [ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হইতেছে।]

অথবা অন্যত্র একই কথা—

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা।

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। [যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সর্বনিয়ন্তা এক স্বরূপ, সেই একই তাঁহার একরূপকে বহুধা করিয়া দিতেছেন।]

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন—নথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। [যেমন মাকড়সা নিজদেহ হইতে তন্তু নির্গত করিয়া আবার নিজদেহে প্রতিসংহার করিয়া লয়, যেমন বসুমতী হইতে ধান, যব প্রভৃতি ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেমন জীবৎ পুরুষ ব্যক্তি হইতে কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই নিখিল জগতের উদ্ভব হইয়াছে।] (১ম মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৭ ॥)

আবার—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্।।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১মমুণ্ডক ১ম খণ্ড ৮।।) [ব্রহ্ম হইতে অন্ন, সেই অন্ন হইতে প্রাণদ্বারা অধিষ্ঠিত বিশ্ব-কারণ হিরণ্যগর্ভ সঞ্জাত হন। ঐ প্রাণ হইতে মনঃসজ্ঞক অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়, মন হইতে সত্যাখ্য আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, পঞ্চভূত হইতে ভূরাদি সপ্তলোক, সপ্তলোকস্থিত মনুষ্যাদি বর্ণ আশ্রম ও ক্রিয়া এবং কর্ম-নিমিত্তক অমৃতাখ্য কর্মফলের উদ্ভব হইয়া থাকে]

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ।। (ঐ—৯)

[ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, তিনিই সর্ববিৎ। এই সর্বজ্ঞতারূপ বিকারই তদীয় তপস্যা। এই সর্ববিৎ ব্রহ্ম হইতেই উক্ত কার্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ, দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি সংজ্ঞা, শ্বেতনীলাদি রূপ এবং ব্রীহিযবাদি অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥]

সৃষ্টি তত্ত্বই বল, প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলাই বল, এই তো উপনিষদীয় নমুনা। শ্রীমজুমদার বলিতেছেন, ইহাই নাকি মানবতাবাদের জন্ম দিয়াছে! জগতের ঐক্য বা মানবতাবাদের গোড়ার কথা হইল বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও দর্শন। বস্তুবাদ যদি নাই স্বীকার করা হয়, তবে সমাজবিজ্ঞানীদের ডাকিয়া লাভ কি? তাহারা তো আর আধ্যাত্মিক মতবাদ হইতে সমাজবিজ্ঞান গঠন করিবে না? মানবতাবাদ বলিতে বুঝায়, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ইহ সংসারের বাস্তব ক্ষেত্রে, সকল মানবের সমান অধিকার। বৈদিক বা তৎপরবর্তী যুগে কোথাও কি তাহার কোনও অস্তিত্ব ছিল? উপনিষদে কি তখনকার সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবেশের কোনও তথ্য পাওয়া যায়? লেখক নিজেই বলিয়াছেন, তখন আর্যভাষী ও অনার্যভাষীদের মধ্যে চলিতেছিল তীব্র সংঘাত, এবং "সেই পরিস্থিতিতে সর্বমানবের ঐক্যের শিক্ষার ঐতিহাসিক ভূমিকা সহজেই বোঝা যায়।" কি বুঝা যায়? ঐতিহাসিক বিচার কি লেখক করিয়াছেন? উক্ত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে যাহারা শাসক, যাহারা আক্রমণকারী সম্প্রদায়, তাহাদের প্রতিনিধিরাই উপনিষদ গড়িয়াছেন। আদিবাসীদের মারিয়া কাটিয়া রক্তের বন্যা বহাইয়া তারপর দিয়াছেন উপনিষদের আধ্যাত্মিক প্রলেপ। ইহা হইতেই নাকি মানবতাবাদের "বলিষ্ঠ" প্রকাশ হইয়াছে! বলিষ্ঠই বটে; 'বল' প্রয়োগ ছাড়া এই তত্ত্ব, এই শিক্ষা, প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

নিছক আধ্যাত্মিক উপদেশে যে সামাজিক চরিত্র বা চেতনা বদলানো যায় না, তাহার প্রমাণ প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা দেখিলেই পাওয়া যায়। উপনিষদের এত "বলিষ্ঠ" ঐক্যতত্ত্ব ও মানবতাবাদ (?) প্রচার করা সত্ত্বেও, কোথাও সর্বমানবের সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। আধিভৌতিক দূরের কথা, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অধিকারও সমান ছিল না, একথা সর্বজনবিদিত। রামরাজ্যেও শূদ্রক তপস্বীর মুণ্ডচ্ছেদ হইয়াছিল যজ্ঞ করিবার অপরাধে।

শ্রীমজুমদার আবার বেদ ও উপনিষদকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখিতে চান। তিনি বলিতেছেন, বৈদিক যাগযজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মূলে ছিল মানুষের জাদু শক্তির উপর বিশ্বাস এবং তাহারা ছিল "মন্ত্র তন্ত্র ও অসংখ্য দেবদেবী ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।" তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রচনাকালের পার্থক্য থাকিলেও উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ। এই জন্য উপনিষদের সাধারণ নাম 'বেদান্ত'। ভূত প্রেত বলিতে কি বুঝায় জানি না! তবে যক্ষ গন্ধর্বের নাম উপনিষদেও আছে, দেব দেবীর নাম তো আছেই। পূর্বেই বলিযাছি, সকল অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রই স্ববিরোধী উক্তি ও স্ববিরোধী সমালোচনায় পরিপূর্ণ। কেনোপনিষদে এই গল্পটি আছে :

কোনও সময়ে দেবতাদের হিতার্থে ব্রহ্ম অসুরবৃন্দকে পরাভূত করেন। কিন্তু দেবতারা মনে করিলেন তাঁহারা নিজেরাই বুঝি দৈত্যনাশ করিলেন। দেবতাদের মনের এই মিথ্যা বোধ ব্রহ্ম বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি দেবতাদের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র কেহই ঐ যক্ষকে চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে উমা আবির্ভূতা হইয়া ব্রহ্মের পরিচয় করাইয়া দিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যজ্ঞানুষ্ঠানও কোন উপনিষদ নিষেধ করেন নাই : "তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।" (কেনোপনিষৎ ৩৩) [শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপশ্চরণ, ইন্দ্রিয়গ্রামসংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান, ঋগাদি বেদ, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ এবং এই জাতীয় অন্যান্য সাধনসকলও পূর্বকথিত উপনিষৎপ্রাপ্তির উপায় এবং সত্যনিষ্ঠা উহার আশ্রয়স্থান।] অন্যত্র: "এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ। (মুণ্ডকোপনিষৎ—১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড ৬) [ঐ দীপ্তিমান আহুতি সমূহ "আইস আইস" বাক্যে সম্বোধন করত "এই পবিত্র ব্রহ্মই তোমাদের যজ্ঞফল স্বরূপ" ঈদৃশ প্রিয়বচন উচ্চারণ সহকারে সৎকার করিয়া যজমানকে আদিত্যরশ্মিসহায়ে ব্রহ্মধামে লইয়া গিয়া থাকে।]

অবশ্য বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র বেদ অধ্যয়ন বা সাধারণ তপশ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা। [তিনি চক্ষুর দৃশ্য নহেন কিংবা বাক্যের বিষয়ীভূত নহেন। কি তপশ্চারণ, কি অগ্নিহোত্র, কি বৈদিক কার্য—কিছুর দ্বারাই ব্রহ্ম পদার্থ

গ্রহণীয় নহে]। কিন্তু তাই বলিয়া তপশ্চারণ প্রয়োজন নাই এমন নহে ; জ্ঞান সহকারে তপশ্চারণ করিতে হইবে। কারণ যে ব্যক্তি ক্রিয়াবান বেদজ্ঞ, ব্রহ্মে নিরত ও পরব্রহ্মবিদিত হইতে অভিলাষী তাহাকেই ব্রহ্মলাভের উপদেশ প্রদান করা যায়।

"ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ংজুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্।' (মুণ্ডকোপানিষৎ) [যে সকল ব্যক্তি ক্রিয়াবান, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মে নিরত ও পরব্রহ্মে বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং একর্ষি-সংজ্ঞক বহ্নিতে শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবে, যে সকল ব্যক্তি শিরোব্রতের আচরণ করেন অর্থাৎ শিরোদেশে বহ্নিধারণরূপ ব্রত করেন, তাঁহাদিগকে ইহার উপদেশ প্রদান করিবে।]

এই সকল যজ্ঞ ব্রতাদি কি জাদুবিদ্যা অপেক্ষাও নিম্নতর পর্যায়ের নয় ? জাদুবিদ্যার তবু কিছু বাস্তব ভিত্তি আছে। জাদুবিদ্যার অর্থ, কোনও বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা, আপাত দৃষ্টিতে যে প্রক্রিয়ার সহিত অভীষ্ট ফলের কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় না। সমস্ত উপনিষদীয় চিন্তাধারা অর্থাৎ উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদ, কোনও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কিংবা কোনও পরীক্ষিত সিদ্ধান্তও নয়। ইহার উপর আস্থাবান হইলে জাগতিক ঐক্যবোধ অথবা বাস্তব মানবতাবাদ জন্মলাভ করিবে, এইরূপ বিশ্বাসও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের সমতুল্য। জাদু প্রক্রিয়া তবু পরোক্ষভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। এই জাদু প্রক্রিয়া হইতেই বিজ্ঞানের (science) জন্ম হইয়াছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য।

"একেশ্বরবাদ চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে, তেমনি বিস্তৃত করে মানব ঐক্যবোধকে"—একথাও সত্য নহে। একেশ্বরবাদই হউক আর বহু দেবতাবাদই হউক, সবই ধর্মীয় ব্যাপার। সব ধর্মই (religion) মানুষের পক্ষে অহিফেন সদৃশ (opium of the people) এবং শ্রীমজুমদার যত চেষ্টাই করুন, ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মীয় রীতির উপর ঐক্য ও মানবতাবাদের [অর্থাৎ গণতন্ত্রের] আবরণ দিতে তাহাতে একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদের মৌলিক চরিত্র চাপা পড়ে না। (Cf. উপনিষদীয় চিন্তায় অধ্যাত্মবাদী এবং রহস্যবাদী দৃষ্টির পাশাপাশি একটি বলিষ্ঠ ইতিবাচক দিক রয়েছে—ইত্যাদি। ...অধ্যাত্ম-

বাদ ও ভাববাদের আবরণ সত্বেও এই মানবতা ধারাটির বলিষ্ঠ প্রকাশের সত্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই—ইত্যাদি] এক সময়ে গর্কি এইরূপ ঈশ্বর-ধারণাকে ঠাঁই দিতে চাহিয়াছিলেন ঈশ্বরকে তাঁহার নিজের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া। তাঁহার সংজ্ঞা—"God is a complex of those ideas elaborated by the tribe, the nation, mankind, which arouse and organise social sentiments with the purpose of binding the individual to society and of bridling animal individualism." [Lenin's letter to Gorky] ইহার উত্তরে লেনিন লিখিয়াছিলেন "It is not true that God is a complex of ideas which arouse and organise social sentiments···God is (from historical and practical standpoint) primarily a complex of ideas begotten by the class submissiveness of man, by external nature and by class oppression—ideas which tend to perpetuate this submissiveness to deaden the force of class struggle···justifications of this idea of God, even the most subtle, even the best intentioned, is a justification of reaction.······your defination is thoroughly reactionary and bourgeois.···ইতিহাসেও দেখিতে পাই একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইবার পূর্বে অথবা ঈশ্বরবাদ অস্বীকার করিয়া প্রাচীনদের চিন্তাধারা, তদানীন্তন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, যতদূর সম্ভব বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

গ্রীক বিজ্ঞান (science), সাহিত্য, দর্শন খৃষ্টধর্ম উদ্ভবের বহুশত বৎসর পূর্বে যে পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল, একেশ্বরবাদ প্রচারের হাজার বৎসর পরেও সে পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ইউরোপীয় রেনেঁসাস্ নিশ্চয়ই মানব ঐক্য ও মানবতাবাদের প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। ইহার ভাবাদর্শ আসিয়াছিল প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্য ও দর্শন হইতে। রেনেসাঁসের নেতারা, একেশ্বরবাদী চার্চকে লঙ্ঘন করিয়া নবাবিষ্কৃত গ্রীক দর্শনকে নেতৃপদে বরণ করিলেন। রেনেসাঁসের কথা বলিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন "The dictatorship of the church over men's minds was shattered ; it was directly cast off by the majority of the German peoples, who adopted Protestantism, while among the Latin a cheerful spirit of free thought, taken over from the Arabs and nourished by the newly-discovered Greek Philosophy, took root more and more and prepared

the way for the materialism of the eighteenth century. [Diatectics of Nature, Introduction] ভারতের ইতিহাসেও অনুরূপ সাক্ষ্য মিলিবে, যদিও প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা অতি অল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং অদ্যাবধি যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। তাহাতেও দেখা যায়, প্রাক-বৈদিক যুগে হরাপ্পা মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিস্তার ঘটিয়াছিল। তাহারা খনি হইতে ধাতুর উদ্ধার ও তাহা কাজে লাগাইবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মোটামুটি জানিত। আবার বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞান যাঁহারা প্রাচীন ভারতে বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কপিল ও কণাদের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা উভয়ই ছিলেন উপনিষদবিরোধী। "সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেসব মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রসিদ্ধ গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত হইবার উপযুক্ত।" [প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার]। কণাদ শব্দের উৎপত্তির তরঙ্গবাদ আবিষ্কার করেন এবং "আলোক ও তাপ" যে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র—কণাদের এই আবিষ্কারও অত্যন্ত বিস্ময়কর [আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র]। মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার "Positive Sciences of Ancient Hindus" গ্রন্থে 'ন্যায়-বৈশেষিক' পদ্ধতি আলোচনায়, উহার স্বরূপবিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তী যুগে একমাত্র নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা ছাড়া কোনও ব্রহ্মবাদী পণ্ডিতই উক্ত চিন্তাধারা অপেক্ষা উন্নততর এবং প্রগতিশীল ভাবধারায় পৌঁছাইতে পারেন নাই। আয়ুর্বেদ [উদ্ভিদ্‌তত্ত্বও ইহার অন্তর্গত], রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। চরকসংহিতায় একটি মজার কথা আছে। যে যুগে বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য বলিয়া পূজিত হইত, সেই যুগে উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে: "বেদ আপ্তাগম, কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও প্রক্রিয়া (Experiment) দ্বারা নির্ণীত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা পরীক্ষান্তে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও আপ্তাগমের তুল্য।" [প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার]। ইহা হইতে অন্তত এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই সকল বিজ্ঞানীদের অবদানে বেদ বা উপনিষদের এবং ব্রহ্মবাদের কোনও প্রেরণা নাই। (আগামীবারে সমাপ্য)

|উপন্যাস|

রাঙামাটি

(গত সংখ্যার পর)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

॥ চার ॥

আহারের মধ্যেও এত আনন্দ থাকতে পারে নবকুমার তা আজ প্রথম অনুভব করলেন। পিসীমা ব্রজরানী কাছে বসে থেকে খাইয়েছেন, রেণুকা স্বহস্তে সব প্রস্তুত করে নিজের হাতে পরিবেশন করেছে। খাওয়াতে এত আরাম তিনি কখনও পান নি।

আহারান্তে ঘরে এসে বসতেই তিনি দেখতে পেলেন, টেবিলের উপর আরো দুটো নূতন জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে, পানের ডিস্ একটা আর একটা সিগারেটের টিন। নবকুমার পান খান না, কিন্তু রেণুকার হাতের সাজা পান খাবার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। একবার ইতস্তত করে পানের ডিসে হাত দিতে যাবেন এমন সময় রেণুকা এল এক কল্‌কে তামাক সেজে নিয়ে। নবকুমার বিস্মিত হয়ে বললেন, "একি, তামাক কী হবে?"

রেণুকা হেসে বলল, "কেন তামাক কি খান না?" রেণুকা কল্‌কেতে ফুঁ দিচ্ছিল, আগুনের সোনার আভা তার সারা মুখে পড়ে সুন্দর মুখখানিকে সুন্দরতর করে তুলেছে। নবকুমার সেই দিকে চেয়ে কথার জবাব দিতে ভুলে গেলেন। রেণুকা বললে, "খুব ভাল তামাক। এখানে বসে গড়গড়া টানলে আপনার সাহেবিয়ানার অপলাপ কেউ দেখতে পাবে না।"

নবকুমার হেসে বললেন, "সাহেবীয়ানার পক্ষে আমি নই। তবে কি জানেন, সুবিধার জন্য ওদের পোষাক পরতে হয়। সাহেব বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলে বা দিদির দৌলতে দু'একদিন সাহেবী খানা না খেয়েও উপায় নেই। কিন্তু আমি মনেপ্রাণে স্বদেশী।"

"তবে আর কি, তামাকের সেবা হোক"—বলে রেণুকা গড়গড়ার উপর কল্‌কে চাপিয়ে দিয়ে নলটা নবকুমারের দিকে এগিয়ে দিল।

নবকুমার ডিস্ থেকে দুটো পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে গড়গড়ার নলে একটা টান দিলেন। সুগন্ধি নরম তামাক। অনভ্যস্ততার জন্য তবু একটু অসুবিধা হল; কিন্তু দু'একবার কেশেই সব ঠিক হয়ে গেল।

নবকুমার যেন আজ স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে যেমন মানুষের নিজের উপর শক্তি থাকে না, নবকুমারেরও তেমনি সবশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। গতকল্য রাত্রি থেকে এই এখন পর্যন্ত তিনি যেন স্বপ্নই দেখছেন। কিন্তু শেষের দিকের স্বপ্নটা বড়ো সুন্দর। স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল কক্ষ অদূরে রেণুকা। সে তাঁকে নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছে, পান সেজে দিয়েছে, তামাক এনে দিয়েছে আর এখন এই নির্জন কক্ষে অই ওখানে তারই দিকে চেয়ে বসে আছে। তামাকের নেশায় এবং কল্পনার মোহে নবকুমারের চক্ষু দুটি মুদে এল। রেণুকা লক্ষ্য করে বললে, "আপনার ঘুম পেয়েছে। ঘুমোন এখন। খুব ভোরেই উঠে দু'জনে বেড়াতে যাব। ভোরে ওঠেন তো আপনি?"

নবকুমার লজ্জিত হয়ে বললেন, "ঘুম পায়নি আমার। বসুন আপনি।"

রেণুকা হেসে বললে, "বাঃ, একজন চোখ মুদে চুপচাপ গড়গড়া টানবে, আর একজন বসে বসে তাই দেখবে! বেশ বিবেচনা আপনার। এমন জানলে কে তামাক সাজত। না, সত্যিই আপনার ঘুম পেয়েছে। আমি আসি" বলে রেণুকা নবকুমারের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নবকুমারের সত্যই ঘুম পেয়েছিল। কিন্তু বিছানায় এসে শুতেই চোখের ঘুম পালিয়ে গেল। তারপর ঘুম না আসা পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে এমন সব কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল, অন্য সময় হলে যা চিন্তা করা তিনি পাপ মনে করতেন।

পরদিন প্রাতে দুজনে হেঁটে চলল বাঁধা সড়ক ধরে। সূর্য উদয়ের পূর্বেই তারা বেরিয়েছে। বাঁ-পাশের আমের বাগানে তখনো তরল অন্ধকার; গাছে গাছে পাখীরা এই সবে জাগতে সুরু করেছে। রেণুকা নবকুমার নীরবে পথ চলছে; কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ চলে তারা হাজির হল একটা পুকুরের কাছে। বাঁধান ঘাট, উপরে ঠেস দেওয়া বেঞ্চের মতো তৈরী দুটো আসন। রেণুকা বললে, "চলুন বসি গিয়ে ওখানে। একটু পরেই রোদ আসবে। শীত করছে না আপনার?"

নবকুমার বললেন, "না, বেশ লাগছে। চলুন বসি গিয়ে।" একটা আসনে দুজনে বসল পাশাপাশি। পূর্বদিক তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই দিকে চেয়ে নবকুমার বললেন, "আজ এতো ভালো লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, যেন জীবনে এই প্রথম সূর্যোদয় দেখতে এসেছি।"

রেণুকা বললে, "তবে যে কলকাতা থেকে এসেই আমার ওপর বড়ো রেগেছিলেন।"

নবকুমার কিছু না বলে একটু হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনার নিজের কথা শুনবার আগে আমারও কিছু করবার আছে।" বলে পকেট থেকে রেণুকার দেওয়া চেকখানা বের করে আবার বললেন, "আমি এটা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।"

রেণুকা তড়িৎগতিতে তার কম্পিত আঙুল দিয়ে নবকুমারের হাতখানা ধরল। মিনতি ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, "না। আপনি যদি নিজে নিতে না পারেন তা হলে কোন হাসপাতালে দান করে দেবেন। তা না করলে সত্যই আহত হব। আমার জন্য আপনার এখানে আসায় হয়ত অনেকের ক্ষতি হয়েছে, এটাকা তাদের ক্ষতিপূরণেও লাগতে পারে।"

এই অনুরোধে নবকুমার সন্তুষ্ট হলেন। এতে রেণুকার হৃদয়ের উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এবার আপনি আপনার নিজের কথা আরম্ভ করুন।"

রেণুকা অত্যন্ত মৃদুভাবে বলল, "হ্যাঁ, করি।" কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। অনেকক্ষণ নীরব থেকে শেষে সসঙ্কোচে বললে, "কিন্তু আপনার কি আজ না গেলেই নয়?"

নবকুমার বিস্মিত হলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরে একটা অজানা পুলকের হিল্লোল বয়ে গেল। করুণাময়ী মা, স্নেহশীলা বোন, প্রেমময়ী পত্নী বিদেশযাত্রী সন্তান, ভাই বা স্বামীর জন্য বোধ হয় এমনি কণ্ঠ সুধাই সংগ্রহ করে রাখে। কণ্ঠস্বরের মধ্যে তাহাদের এমনি মিনতিই বোধ হয় ঝরে পড়ে। নবকুমারের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। কিন্তু সে আর্দ্রতা যথাসাধ্য গোপন করে মুখে খানিকটা হাসি এনে বললেন; "কেন বলুন তো?"

রেণুকা রাঙা হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্য। বললে, "এখানে যারা আসেন তাঁরা বাবার প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল, হাসপাতাল না দেখে যান না। দেখবেন না সে সব কিছু?"

নবকুমার বললেন, "কলকাতায় আমার এত কাজ পড়ে রয়েছে যে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। যদি কখনও সুযোগ হয় নিশ্চয় এসে দেখে যাব। বাবার সঙ্গে এসে আপনার বাবার অনেক কীর্তি আগে দেখে গেছি। এখন সে সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। 'লণ্ডন ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলিতে' একটি আদর্শ ভারতীয় গ্রাম দিয়ে রাঙামাটির ছবিও বেরিয়েছে, দেখেছি। তখন কিন্তু সে রাঙামাটি যে আমার দেখা তা মনে পড়ে নি।"

রেণুকা মনে মনে বললে, "আবার ভুলতে কতক্ষণ!"

সূর্য তখন পূর্বদিক রঙিন করে আকাশের অনেকখানি উপরে উঠেছে। শীতের সুখস্পর্শ সোনার রোদে সারা পৃথিবী ভেসে গেছে। সেই রোদ এসে পড়েছে রেণুকা নবকুমারের সারা শরীরে। রেণুকার রোদে ধোয়া দেহখানি আরও কমনীয় আরও মধুর দেখাচ্ছে। তার কাঁধের উপর চাপানো কাশ্মিরী সবুজ রঙের আলোয়ানখানার ধার দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। মাথার কাপড় সরে গিয়ে সমুখের চুলগুলো বের হয়ে গেছে। সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদ ঢুকে চুলের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নবকুমার সমুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, মাঠে মাঠে হলুদে রঙের অজস্র সরিষার ফুল ফুটে রয়েছে। পাশে সাদা কাশের ফুলের মত আক ফুলের রাশি বাতাসে দোল খাচ্ছে। সবকিছুই রৌদ্র-ধৌত, অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত। দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে নবকুমার রেণুকার দিকে চাইলেন। রেণুকাও ঠিক সেই সময় নবকুমারের দিকে চেয়েছে। রেণুকার সহিত দৃষ্টি মিলতেই আজ সর্বপ্রথম কর্তব্যপরায়ণ নীরস হৃদয় ডাক্তার একটা অজানা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। সেই লজ্জা সামলাতে তাঁর কয়েক মিনিট কেটে গেল। পরে বললেন, "কিন্তু আপনি তো নিজের কথা কিছু বললেন না?" নবকুমারের স্বভাবতঃ কর্কশ কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে এত কোমলতা, এত মাধুর্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা তিনি নিজেই জানতেন না।

রেণুকা আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললে, "দেখুন এখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না।"

নবকুমার সেকথার কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রেণুকার উপর স্থাপন করে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, "মানে—?"

রেণুকা হাসল। বললে, "মানে, এত বড়ো জমিদারী—শুধু জমিদারী নয়, হাসপাতাল, স্কুল, কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ আমাকে দেখতে হয়। অবশ্য প্রতি বিভাগেই উপযুক্ত লোক আছে। কিন্তু সকলের বিশ্বাস আমি আর সবার চাইতে ভালো বুঝি"—বলে সে চুপ করল।

নবকুমার প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "সে তো ভালো কথা। নিজের কাজ নিজে দেখবেন এর মতো আর ভালো জিনিস নেই।"

রেণুকা বললে, "কিন্তু আমি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছি। তাই—"

নবকুমারের একবার ইচ্ছা হল, জিজ্ঞাসা করেন রেণুকা এখনো বিবাহ করে নি কেন। কিন্তু কথাটা একজন তরুণীকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

রেণুকা বলে চলল, "তাই আমি ঠিক করেছি এরপর থেকে কলকাতায় গিয়ে থাকব। টাকার আমার অভাব নেই, আর টাকার অভাব না থাকলে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবের, আমোদ-প্রমোদের অভাব হবে না।"

নবকুমার নির্বাক হয়ে গেলেন। এই একটু আগে যে রমণী তাঁর ধারণার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল মুহূর্তের মধ্যেই সে আবার ধূলিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মুখের ভাব ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসতে লাগল।

রেণুকা কিন্তু তা লক্ষ্য না করেই বলে চলল, "আমি কলকাতায় গিয়ে বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা বাড়ি নেব। কিন্তু একেবারে নির্বান্ধব হয়ে যাওয়াটা আমি ভালো মনে করি না। প্রথম আলাপটা আপনাকেই করিয়ে দিতে হবে। মনোরমা হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন, তা হলেই হল। তা হলেই আমি সব ঠিক করে নিতে পারব।"

মনোরমার সম্বন্ধে নবকুমারের একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল। রেণুকার কথাতে সেই অজ্ঞাত ক্ষতস্থানেই যেন আঘাত পড়ল। মনোরমা বিনয়েন্দ্র—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অমিতব্যয়ী। তাঁদের সেই অমিতচারিতার সুযোগে সবাই মিলে তাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। আজ রেণুকা আবার ওদের মতোই দরাজ হাতে সবার সমুখে যেতে চায়। সে টাকা দিয়ে আনন্দ কিনবার ইচ্ছা করে।

যে পুরাতন কলকাতার সুষ্ঠু আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকটি সুনির্বাচিত বন্ধুর সহিত তাঁর মাতা চলাফেরা করতেন সে কলকাতা আর নেই।

তার স্থানে স্টাইল সর্বস্ব মহিলারা ঘোরাফেরা করে। উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা বিনাদ্বিধায় তাদের স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত মেলামেশা হাসি-পরিহাস নিজের চোখে পরিদর্শন করছে। সুবিধাই হয়ে উঠেছে এখন বিবাহের চরম উদ্দেশ্য। সেই সমাজে মিশবার জন্য এক চপলমতি তরুণী তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছে। নবকুমার অনেকক্ষণ নীরব থেকে শেষে বললেন, "আপনার এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার চেয়ে আরো ভালো এবং মহত্তর পথ আছে। সেই পথই বেছে নিন্ না কেন? অন্য কোন কাজ না থাকে দেশ-বিদেশে ঘুরে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে বেড়ান। আপনার কাছ থেকে কী পেতে পারে তার প্রত্যাশা না করে যারা আপনার জন্যই আপনার বন্ধুত্ব চাইবে তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করুন। মনোরমাদের আমি চিনি। তাদের সমাজ চমকপ্রদ এবং অনেকের আকাঙ্ক্ষিত তা সত্য কিন্তু ওরা হচ্ছে সুদৃশ্য বার্নিশ করা জাপানী জিনিসের মত। বাইরের চমৎকারিত্বে ভিতর বুঝবার জো নেই। আপনার মত সংসার অনভিজ্ঞা একজন তরুণী গিয়ে সেখানে আনন্দ না পেয়ে দুঃখই পাবেন; মানুষের উপর বিশ্বাস আপনার টুটে যাবে! যখন সব ভাগ্য-অন্বেষণকারীর দল আপনার চারিদিক ঘিরে দাঁড়াবে তখন আপনি কি করবেন বলুন তো?"

নবকুমার ক্ষণিকের জন্য অন্তরের তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে রেণুকার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। তার জন্য যে নবকুমার বিবেচনা করে কথা বলেছেন তাতে রেণুকাও অন্তরের মধ্যে এক প্রকার বিজয়ের আনন্দ অনুভব করল। বললে, "বাবার মৃত্যুর পর এত বড়ো জমিদারী আমাকে একাই দেখতে হয়। ভয় জিনিসটা আমার মধ্যে খুব কমই আছে। আর মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন, তাও আমার যথেষ্ট আছে। বাহির থেকে মাত্র আপনি আমাকে বিচার করছেন। আর একটা কথা শুনলে বোধ হয় আপনি হাসবেন। আমারও একটা নিজস্ব দার্শনিক মত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, যারা উপায় থাকতে ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে একটামাত্র দিকে ফেলে রাখে, তাদের মত মূর্খ আর নেই। আমি জীবনটাকে সবরকমভাবে আস্বাদ করতে চাই। ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সব রকম লোকের সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ হতে চাই। তার সুযোগও আমার রয়েছে। আপনি কি মনে করেন, আমি না ভেবে-চিন্তেই আপনাকে এখানে ডেকেছি? আজকার এই দিনটা বহুকাল ধরে আমার

মনের মধ্যে ছিল। কতদিন থেকে আপনাকে ডাকব বলে মনে করেছি কিন্তু লজ্জায় পারি নি। শেষে প্রয়োজন লজ্জাকে জয় করল। আমি বিশ্বাস করি না যে, এই সামান্য কাজটুকু আপনি আমার জন্য করবেন না।” বলে সে চুপ করল।

নবকুমার বললেন, “কী বিশ্রী কাজের ভার আপনি আমার উপর চাপাচ্ছেন তা বোধহয় জানেন না। সত্যি বলছি আপনাকে, আপনি যে সমাজে মিশতে চাচ্ছেন সে সমাজকে আমি ঘৃণা করি, অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তা যাক্, মনোরমাকে আপনার কথা বলব। সে আপনাকে পেলে নিশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু যে স্বর্ণমৃগের লোভে আপনি সেখানে যেতে চাচ্ছেন তা সত্যই স্বর্ণ নয়। উপরে পালিশ করা। বুঝবার উপায় নেই। অবশ্য কিছুদিন থাকলেই বুঝবেন।”

রেণুকা বললে, “আপনার পাদ্‌রী হওয়া উচিত ছিল। গীর্জা ঘরে আপনার গলা বেশ খাপ খাবে।”

ব্রজরানী ঠিক করে রেখেছিলেন যে, নবকুমার এলেই তাঁর সঙ্গে রেণুকার বিবাহের ঘটকালী তিনি নিজেই করবেন। কিন্তু রেণুকা এমনি যে নবকুমারকে বাইরে বাইরে নিয়েই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিল। তিনি কথা পাড়বার সুযোগই পেলেন না। তখন ব্রজরানী নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, রেণুকা সোমত্ত মেয়ে, নিজের ভালমন্দ ভালো করেই বুঝে। সে কি আর নবকুমারকে এখানে আনবার উদ্দেশ্যটা না বলবে? আর আজকালকার ছেলে-মেয়েরা নাকি নিজেদের বিবাহের কথাবার্তা নিজেরাই চালাতে ভালবাসে। তাই, রেণুকা যখন নবকুমারকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে ফিরে এলো তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, “তারপর সব ঠিক হয়ে গেলো?”

রেণুকা বুঝতে না পেরে বলল, “কিসের?”

ব্রজরানী মনে করলেন, রেণুকা বুঝতে পেরেও ন্যাকামি করছে। হেসে বললেন, “তোর বিয়ের, আর কিসের? নবকুমার বেশ ছেলে। দাদার পছন্দের তারিফ করতে হবে।”

রেণুকা বাধা দিয়ে বললে, “কি যে বলো তুমি? তাঁকে বিয়ের কথা বলতে যাব আমি?”

ব্রজরানী আকাশ থেকে পড়লেন। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, ভগবান করে নবকুমারকে তাদের কাছে জুটিয়ে দিলেন, আর রেণুকা কিনা সেই সুযোগ হেলায় হারিয়ে ফেলল। চিৎকার করে বললেন, ' দাদার কি ইচ্ছা ছিল তা কি তুই জানিস না? যদি নিজে না বলতে পারবি তো আমাকে বলতে বললি না কেন?" বলে তিনি অগ্নিবর্ষা চোখে রেণুকার দিকে চাইলেন। রেণুকা মনে মনে পিসিমাকে ভয় করত। সে কিছু না বলে সেখান হতে সরে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

মাস দুই পরে রেণুকার কাছ থেকে নবকুমার একখানা চিঠি পেলেন :—

প্রীতিভাজনেষু,

আশা করি আপনি আমার কথা ভুলে যান নি। আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি। আমার কথা শীঘ্রই মনোরমাকে জানালে বাধিত হব। তিনি যদি আমাকে তাঁর বাড়িতে আহ্বান করেন তা হলে নিজেকে অনুগৃহীত মনে করব। ইতি

রেণুকা।

কলকাতার বুকের উপর দিয়ে তখন বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করেছে। পাশের বাড়ির খাঁচার কোকিলের কণ্ঠ গেছে খুলে। সযত্ন রক্ষিত শিরীষ গাছটায় রেশমের মত চুল মাথায় ফুল পরিয়ে ফাগুনের হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। মানুষের রচিত নগরের উপরেও ফাগুন তার রঙিন হাতের পরশ বুলাতে ভুলে নি। নবকুমারের মনেও রঙ ধরেছে।

রাঙামাটি হতে আসার পর থেকেই নবকুমারের মনের আকাশে শরৎকালের রোদমাখা লঘু মেঘের মতো রেণুকার কথা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রজনীর অন্ধকারে ছাদে একলা বসলে কার দুই চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি তার সমুখ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। এমন সময় এল রেণুকার চিঠি।

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত চিঠি তাঁর ভালো লাগল না। দুঃখের বিষয়, এই কথাগুলি ছাড়া চিঠির শেষে একটুখানি 'পুনশ্চ'ও নেই।

দীর্ঘ চিঠি অবশ্য নবকুমার পছন্দ করেন না। চিঠি হবে টু দি পয়েন্ট, বাজে কথা দিয়ে চিঠির বুক পূর্ণ করার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু রেণুকার কথা হচ্ছে স্বতন্ত্র। তাকে আর পাঁচ জনের মত ভাবতে তিনি

পারেন নি। তাঁর কাছে রেণুকা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। তিনি তাকে ঠিক মতো বুঝতে পারেন নি। তার রহস্যময় চোখের কুহেলিকা ভেদ করতে তিনি অক্ষম। তার সুকোমল তনু দেহের লাবণ্য, গর্বিত মরালোপম গ্রীবা সঞ্চালন, তার পবিত্র অন্তরের সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করে তুলেছে। যে পথে রেণুকা নিজেকে পরিচালিত করতে চায় সে পথের উপর সহানুভূতি নবকুমারের নেই। দূর পথ দেখে তার সৌন্দর্যে রেণুকা আকৃষ্ট হয়েছে, দূরের মায়া মনোহারিণীই বটে। সেই পথ সম্বন্ধে যখন রেণুকা সত্যকারের অভিজ্ঞতা লাভ করবে তখন হয়ত সে আর এই পথে যেতে চাইবে না; তার সারল্য, তার ব্যক্তিত্ব কখনো তাকে ভুল পথে থাকতে দেবে না। রেণুকার সরলতার সঙ্গে মনোরমাদের কৃত্রিমতার তুলনা করতে গিয়ে নবকুমার ব্যথিত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ আজ তাঁর মনে হল তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেউ নেই। তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ।

জানালার পাশের রাস্তা দিয়ে এক বাঁশীওয়ালা এক তাড়া বাঁশী বগলে নিয়ে একটা বাঁশের বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে। তার বংশীধ্বনিতে বসন্তেরই কণ্ঠ যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

এই বাঁশী তাকে গ্রাম্য গোচারণ মাঠে রাখাল বালকের সরল উদাস বাঁশীর সুর মনে করিয়ে দিল। জীব স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গতা বিরোধী। বসন্ত হচ্ছে মিলনের প্রতীক। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরে এই সময় ব্যথাটা যেমন বেজে উঠে, এমন কোন সময় নয়। নবকুমারের সমস্ত অন্তর আজ হাহাকার করে উঠল।

কিন্তু রেণুকাকে তিনি যে উত্তর লিখলেন তা অতি সংক্ষিপ্ত, যেন টেলিগ্রাম্—

যা বলেছেন করব।

নবকুমার।

(ক্রমশঃ)

গল্প

লাশ-ঘর

দীনেশ রায়

অবশেষে সদর হাসপাতালের একটি কট্ জুড়ে শশাংকর অস্তিত্ব। প্রথম প্রথম ব্যাপারটি অভিনব ঠেকেছিল। এখন, বেশ কিছুদিন পর; ওর এই অচলায়তন অস্তিত্ব ক্লান্তিকর, দুর্বহ মনে হয়। অথচ মুক্তি নেই। কেননা একাদিক্রমে পাঁচবার রক্ত দেবার ফলে নিম্নরক্তচাপ জনিত দুর্বলতার সঙ্গে নানাপ্রকার শারীরিক অস্বস্তির উদ্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডাঃ বোসের স্নেহাধিক্যে ও মেট্রন শীলা হালদারের উৎসাহ-প্রাবল্যে ও যখন হাসপাতালের একটি কট্ দখল করল তখন পুরোপুরি স্নায়ু-দুর্বলতার কবলে। ও নিজেই অনুভব করে, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন অদম্য বাসনা ওর রক্তে নেই। কারণ এখনও দুর্বল বা দুর্বলতা-বোধ ওর মনে। এ-শহরে নিজের অফিসটুকু ছাড়া ওর কাছে আর কিছু আকর্ষণীয় নয়। প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত শশাংক এ-শহরে নির্বাসিতের মত থেকেছে। ওর আবাল্যস্মৃতি হাসপাতাল ঘিরে করুণ বিষণ্ণতা। বাল্যকাল থেকেই ও হাসপাতালের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলেছে। হাসপাতালের কাছাকাছি এলেই বিষণ্ণতার গন্ধ ওকে বিমর্ষ করে তুলত। কখনো কখনো অসুস্থ বোধ করত। তখন একথা ভাবতে পারে নি জীবিকার তাগিদে সেই বিষণ্ণতা ঘিরেই ওর অক্ষপথ হবে। তখন প্রতিজ্ঞা ছিল, এমন হবে না, কখনোই নয়। অন্য কিছু একটা হবেই। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে, জীবন থেকে দূরে, বহুদূরে এখানে পালিয়ে এসে দেখল, সেই হাসপাতালই ওর কর্মস্থল।

জেলা শহরের এই হাসপাতালে প্রথমদিনই ভীষণ অসুস্থ বোধ করেছিল শশাংক। মনে পড়েছিল, বাল্যকালে একদিন ঠাকুমাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল। ঠাকুমাকে দেখা হয় নি। ঘুরে ঘুরে অসংখ্য অন্য রোগীদের দেখেছিল। একজনকে আজও মনে পড়ে। পার্টিশন দেওয়ালের পাশে স্তূপীকৃত অন্ধকারের মাঝে লোকটি শুয়েছিল। কাছে যেতেই দেখেছিল লোকটির দুচোখে জল। বালক-সুলভ চপলতায় ও প্রশ্ন করেছিল।

—আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কোনও আত্মীয়-স্বজন আসেন নি?

লোকটি নিরুত্তর। শশাংক কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে—আপনার অসুখটা কি?

লোকটি ডুকরে উঠেছিল। ডান-পা কোমর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। তিনমাস লম্বা হয়ে শুয়ে থেকে থেকে পিঠে ঘা হবার উপক্রম, তবু কোমরের ঘা শুকোয় না। ডাক্তারদের আশ্বাস খুব শীগ্‌গির সেরে উঠবে। উনি কিন্তু বুঝতে পেরেছেন, এ কালক্ষত সারবার নয়। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। স্ত্রী-পুত্র আগে আসতেন। এখন বাড়তি পয়সার অভাবে তাও ছেড়ে দিয়েছেন। লোকটি শশাংকর বাবাকে বলেছিল,

—আচ্ছা বলতে পারেন, এরা আমাকে ছুটি দেয় না কেন?

শশাংক সেই বয়সেই বুঝতে পেরেছিল লোকটির মৃত্যু সন্নিকট। যে ক-দিন নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে সে কদিন জীবন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু অনিবার্য সমস্যার কথা স্মরণ করে জীবন্মৃত অবস্থায় বিপন্ন বোধ করবে। সেদিনই হাসপাতাল সম্পর্কে এক স্থায়ী বোধ নিয়ে ও ঘরে ফিরেছিল। আজও ওর মনের আকাশ জুড়ে বিষণ্ণতার কালো মেঘ। হাসপাতালের কটে শুয়ে নিজের অগোচরে কোনো কোনো সময়ে নাড়ী টিপে দুর্বল, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শব্দের গতি অনুভব করে। কখনো কখনো নিজেকে মুমূর্ষু মনে হয়। এই বুঝি মরবে। তবু শশাংক ভীত নয়। শুধু হতাশা শিরায় শিরায়। পালিয়ে এসেও নিস্তার নেই। কলকাতায় নিজের বলতে কেউ ছিল না। তবু বহু চেনামুখের ভিড় সেখানে। ওই মুখগুলো দেখে শশাংক ভয় পেত। তাই হাসপাতালে হলেও, এ-চাকরি নিতেও দ্বিধা করে নি। অন্তত চেনামুখ ওকে কেন্দ্র করে গুঞ্জরিত হবে না। কিন্তু এ-শহরের মানুষ-মানুষীরাও ওকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। শশাংকর জীবনে সম্ভাবনার অংকুর দখতে পায়। কিন্তু ও নিজে জানে, এ-কখনই হতে পারে না। এ-জীবন সম্পর্কে ওর নিজের কোন স্বপ্ন নেই। কখনই নিজেকে সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল ভাবতে পারে না। এখন মনে হয়, নিরাত্মীয়, নির্বান্ধব এক মহাশ্মশানে ওর অধিষ্ঠান। রাতের নৈস্তব্ধ্য চিরে রোগীদের গোঙানি, আর্তনাদ ভীষণতর হয়ে ওর কানে বাজে। কোন কোন দিন মৃত রোগীর আত্মীয়-স্বজনের সমস্বর শোক-ধ্বনিতে ওর বুকে হিমপ্রবাহ। ও চোখ বুঁজে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। ঘুমোয় না। কেননা এই কটে

শুয়ে নিজের জীবনটাকে এরপরেও বাঁচানোর কোনও সদর্থ আছে কিনা, এমন চিন্তার অখণ্ড অবকাশ পেয়েছে। তাই নিশ্চুপে শুয়ে থাকে। সামনের ঝুরনামা প্রাচীন বটবৃক্ষে নিঃশব্দ বাদুড়ের ডানা ঝটপটানির শব্দ। ওর মনে হয় বাদুড়টি উড়তে গিয়ে দিশাহীন হয়ে ইলেকট্রিকের টানা তারে জড়িয়ে পড়বে। আর কিছু বোঝার আগেই মৃত্যু। একের পর এক মৃত্যু। স্বভাবতই স্নায়ু-জর্জর শশাংক অনিদ্র। অথচ এই কট আশ্রয় করার আগে, ঘুমই ওর বাঁচার প্রধান কারণ ছিল। কেননা, ঘুমেই কেবল, যতই সাময়িক হোক্ না কেন, স্বস্তি। শারীরিক দুর্বলতা থেকেই যে ওর এই নিদ্রা আসক্তি এ বিষয়ে মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত ভাবত প্রগাঢ় নিদ্রা সুস্থতারই লক্ষণ। এ নিয়ে সহকর্মীদের ব্যঙ্গ উপহাস গঞ্জনাও ওকে টলাতে পারে নি। বস্তুত, এদের কাজে কথায়-আচরণে শশাংকর আস্থা ছিল না। ফলে, ওদের কথায় শশাংক বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করে নি। শুধু বয়সিনী শীলাদির কথায় মূল্য না দিয়ে পারে নি। ওঁর দিকে তাকিয়ে শশাংক নিজের কথা ভুলে যায়। বিগত যৌবনা, কুরূপা শীলাদি আজ চল্লিশের কাছাকাছি এসেও মাথা উঁচু করে চলতে পারেন। কিন্তু বাঁচার মত সামান্যতম উপাদানও ওঁর জীবনে নেই। তবু সকলের প্রিয় হয়ে শীলাদির জীবনটা একটা নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। শশাংক এই ভেবেই বিস্মিত হয়। এ কি করে সম্ভব? নিজের মত ব্যাখ্যা তৈরি করে নেয়। মেয়েদের চৈতন্যের সীমা প্রসারিত নয় বলেই হয়ত শীলাদি বাঁচেন। আর শশাংকরা মরে যায়। তবু শীলাদি যখন ওর নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা-আসক্তি আর এ-শহরে ওর প্রধান আকর্ষণ অফিস-লাশঘর প্রীতির কথা শুনে প্রশ্ন করেন তখন শশাংককে উত্তর দিতে হয়।

—শশাংক এত ঘুমোও কি জন্যে? আলসে হয়ে যাবে যে। শশাংক প্রথমে উত্তর দেয় নি। শীলাদি সবিশেষ পীড়াপীড়ি করলে ওর চোখ দুটো বুঁজে আসে।

—কেন যে ঘুমোই শীলাদি? সে কি বলে বোঝান যায়? শীলাদি বিস্ময়চকিত। শশাংক একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে আবার বলে—

—ধরুন যদি বলি আর তো কিছু করার নেই—তাই ঘুমোই। শীলাদি এবার ধমক দেন।

—কিছু করার নেই, এ কখনোই হতে পারে না। গল্পগুজব, খেলাধুলা, পড়াশুনা, কিছু আড্ডা—

শশাংক হো হো করে হাসে। হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে শীলাদির কথাগুলো নদী পেরিয়ে দূর দূরান্তে কোন অরণ্যের প্রান্তে পৌঁছে যায়। শীলাদি বুঝতে পারেন না।

—কি, তুমি হাসছ কেন ?

—শীলাদি কতগুলো স্থূল লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভাল লাগে না। তার চেয়ে ঘুম অনেক ভাল। আর ভাল আমার আফিস-লাশ ঘর। শীলাদি চম্‌কে ওঠেন। লাশ-ঘর। শশাংকের ভাল লাগে। কেন ? মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। লাশ-ঘর ভাল লাগে। এ এক চরম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। উনি এও বোঝেন না। শশাংকের কথাগুলো হেঁয়ালি মনে হয়। এ-পৃথিবীতে বাঁচতে হলে মানুষের সঙ্গ-সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি বলেন,

—শশাংক একা একা তুমি কি করে দিন কাটাবে ? মানুষের সঙ্গ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। তাই নয় কি ?

শশাংক ডুবে যায় গভীর চেতনা-সমুদ্রে—মানুষের সঙ্গ। বাবা-মা-স্ত্রী-আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু-সহকর্মী সকলেই মানুষ। এঁদের সান্নিধ্যে আমাকে কোন না কোন সময়ে থাকতে হয়েছে। রক্তের উত্তাপ শৈশবে অনুভব করেছি। বাবা-মার মৃত্যু এক প্রকাণ্ড হিমশৈল। তার চাপে আমার সমগ্র সত্তা হিমেল। আর স্ত্রী শোভনা—ওকে মনে পড়লেই আমি কাটা পাঁঠার মত ছটফট করি। ও আমার অস্তিত্বের আমূল উপড়ে নিয়েছে। আর এরা কত সংকীর্ণ। নির্মল, শচীন, ঝর্ণা, সীমা—আমার সহকর্মী। আমার প্রতি ঝর্ণার দুর্বলতায় নির্মল সাপের মত হিংসাকুটিল। যদিচ ওকে আমি ভাল করেই জানতে দিয়েছি ঝর্ণাকে ঘিরে আমার কোন মোহ নেই। সুতরাং ঝর্ণার মোহ কেটে যাবেই। ঝর্ণা আসে ওর যৌবন নিয়ে। অমিত স্বাস্থ্য। নিখুঁত যুবতীর সান্নিধ্যে আমার রক্তে লালসা নৃত্য করে মাত্র। লালসা পেরিয়ে কোনও শুদ্ধতার সীমায় আমি পৌঁছতে পারি না। আমার রক্তেরই যে সে অধিকার নেই। একথা ঝর্ণাকে বলা যায় না। লালসার যেখানে উত্তরণ সেখানে আমি কখনই কিছু দিতে পারব না। তাই ওকে আমি আসতে নিষেধ করেছি। সীমা একইভাবে নির্মলের মত সংকীর্ণ। শচীন কি ভীষণ স্বার্থপর। একই ঘরে দুজনে থাকতাম। আমার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করতে ওর কোন দ্বিধা হয় নি।

আমি কিছু বলি নি। আদতে আমার বলার মত প্রবৃত্তি হয় নি। এরপর আর এদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। আর কি জানেন, আপনাদের আত্মকরণ ক্ষমতায় আমি ঈর্ষান্বিত। এ-হাসপাতাল আপনার, নির্মলের, ঝর্ণার। আমার নয়। বা সত্যিই কারো দখলে নেই। শুধু বোধের রাজত্বে এ হাসপাতাল আপনাদের। অপারেশন থিয়েটারের টেবিল, শ্যাডোলেশ্‌ আলো, যাবতীয় যন্ত্রাদি, হিটার, রেফ্রিজারেটর সবই যেন ঝর্ণার। এগুলোর দখলীকরণেই ঝর্ণার অস্তিত্ব অর্থময়। আর নির্মল। ওর বোধ আরো জাগ্রত। কারণ ও ঝর্ণা, সীমা, শীলাদি আপনাকে হাসপাতালের সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। ডাঃ বোস। কতকগুলো রোগী তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকায় আশ্চর্য সমাহিত। শীলাদি, আপনার দখলে ঝর্ণা, সীমা ওরা সকলে।

এমন আত্মকরণবোধের সংঘাতেই ওরা পরস্পর কাছে আসে। সঙ্গ-সান্নিধ্যে উত্তাপ অনুভব করে। আবার মাঝে মাঝে সংঘর্ষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শশাংক এমন বোধে আচ্ছন্ন নয় বলেই ওদের সঙ্গে ওর সংঘাতও নেই, সম্পর্কও নেই। তবে ও যখন আনাটমি ডিপার্টমেণ্টের লাশ-ঘরে যেত তখন আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভবে দুলত। পরপর কতগুলি চৌবাচ্চা। ওপরে কাঁচের ঢাকনা। ঘরময় ওর খুব পরিচিত রাসায়ন-লাইজল-ফর্মালিন-পূতি গন্ধ। এ-গন্ধে ওর অসুবিধে হয় না। ও দাঁড়াত চৌবাচ্চার সামনে। হরেকরকমের মৃতদেহগুলি পর্যবেক্ষণ করত শশাংক। ইদানীং ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারত কোনটি পচন পেরিয়ে গলতে শুরু করবে। সেটা সর্বপ্রথম ছাত্রদের জন্য পাঠিয়ে দিত। ঝগড়ু লাশ পৌঁছে দিয়ে আবার যখন চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে আসত তখনো শশাংক সেই শূন্য চৌবাচ্চার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে। এই শূন্যতা ওর বুক জুড়ে, ওর দেহ জুড়ে। শশাংকর মনে সংঘাত। মৃতদেহগুলির জন্যেও ওর বুকে ব্যথা রিন্‌ রিন্‌ করে। ছাত্ররা ফালা ফালা করে আনাটমি শিখবে। তারপর মুদ্দফরাস টুকরো টুকরো মাংসগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেবে আর হাড়গুলো মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে। অস্তিত্বের শেষ-চিহ্নও আর থাকবে না। এই মৃতদেহগুলির হিসেব ওকেই রাখতে হত। স্টকে একটির গরমিল হলে, জবাবদিহি করতে হয়। শুধু তাই নয়, মুদ্দফরাস যথারীতি সৎকার করল কি না, এবিষয়েও শশাংককে দৃষ্টি

রাখতে হয়। আর মৃতদেহের হিসেব-নিকেশ ঠিক রাখতে শশাংকর মত নির্বিরোধী কর্মচারী দুর্লভ, কেননা শশাংক মৃতদের সাহচর্যেই অধিক স্বস্তি বোধ করে। ওদের কাছে কোনও প্রশ্ন নেই, কৈফিয়ৎ নেই। ওরই মত নির্বিবাদী, নির্বিকার। আপাদ-মস্তক আবৃত মৃতদেহগুলি ঝগড়ু যখন নিয়ে আসে, শশাংক দেখে কোন নিদ্রিত মানুষ। ঠিক অন্য ঘুমন্ত মানুষের মত নয়। নিথর, নিস্পন্দ, ঋজু শরীর। হাসপাতালের বেওয়ারিশ মৃত রোগীরাও শশাংকর হেফাজতে কদিনের জন্যে থাকে। শশাংক এদের সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক, যত্নপরায়ণ। কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়ত এদের শেষ অস্থিটুকু পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত হবে। এদের প্রাণহীনতার গন্ধে জায়গাটা সোঁদিয়ে উঠলেও শশাংকর আপত্তি থাকে না। ওর এমনতরো আসক্তিতে ঝর্ণা, সীমা এমন কি শীলাদিও সন্তপ্ত। নির্মল, শচীনের মতে ও ধাঙড়দের সমপর্যায়ভুক্ত। ওদের মন্তব্য, কটু-কাটব্য শশাংক নিশ্চিন্তে উপেক্ষা করতে পারে। কারণ জীবনের অনেক প্রকার সমস্যা মৃত্যুতেই নিশ্চিন্ত একথা ওর জানা। নিজের জীবনটাই কত প্রকার সমস্যার উদ্ভব করেছিল। এক মৃত্যুই আবার নিশ্চিন্ত করতে পেরেছে ওকে। এখন মনে হয়, শোভনার মৃত্যুতে ও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। বরং নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েই গেছে। আরো অন্য সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ঝর্ণা ওর এক নূতন সমস্যা। ও এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। ঝর্ণা আশা ছাড়ে নি। ওর কথামত দূরে সরে থেকেছে। তবু শশাংক অনুভব করেছে একজোড়া দৃষ্টি কি সুগভীর প্রত্যয়ে ওর কাছে আশ্রয় খুঁজছে। অলক্ষ্য থেকে ঝর্ণার অস্তিত্ব ওর জীবনে ছায়াপাত করেছে। তখনই রক্তে বিপ্লব। অন্তর ক্ষত বিক্ষত। কারণে অকারণে বারবার রক্তদান করেছে। এমন রক্তের কি প্রয়োজন? যে রক্তে সৃষ্টির বীজ নেই। জীবনকে সুন্দর করতে পারে না। ঝর্ণাকে কি করে বোঝাবে ওর রক্তের অন্তর্গত ব্যর্থতার ইতিহাস। কাজেই ঝর্ণাকে বারবার নিষ্করুণ রূঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ইতিহাস কোনদিন ওকে বলা যাবে না। শশাংক শিউরে ওঠে। অপরিসীম গ্লানিতে শরীর-মন নুয়ে আসে। এই কি জীবন! এই কি বাঁচা! কতদিন ঝর্ণার প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরে শশাংক সচকিত হয়েছে।

—শশাংকবাবু আমি দেখব, আপনি কতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন? আমিও ততদিন অপেক্ষা করব।

এ-কথা নিরন্তর ওর কানে গুঞ্জরিত হয়েছে। কিন্তু আর নিজে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। দূরে সরে গেছে। আর অন্যদিকে অসীম আকর্ষণে লাশ-ঘরের দিকে ছুটেছে। এগুলোর হিসেব—তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করেছে। প্রতিবারই যখন ছাত্রদের জন্যে লাশ নির্বাচন করে দিতে হয়েছে, তখনই যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে। মনে হয়েছে জীবন-মৃত্যু কিছুই ওর কাছে ধরা দিচ্ছে না। কারো সান্নিধ্যই ও যথাযথ উপভোগ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত সব মৃতদেহগুলি যদি সংরক্ষণ করা যেত। বুক পকেটের কলমটার মত হয়ত এরাও কেউ কেউ অবিচ্ছেদ্য হয়ে জড়িয়ে পড়ত জীবনের সঙ্গে। আবার এ ভেবেও স্বস্তি পায়, মৃতদেহগুলির অস্তিত্ব সম্ভবত নবতর সমস্যার সৃষ্টি করত।

এতৎসত্ত্বেও এ-শহরে অবস্থানকালে ওর একমাত্র সঙ্গী এই মৃতদেহগুলি। কারো সঙ্গে বেশিদিন টেকে না। হয়ত কয়েক-ঘণ্টা মাত্র। এমনই একটি যুবতী মেয়ের মৃতদেহ ঝগড়ু একদিন নিয়ে এল। ফিমেল সার্জারী ওয়ার্ডের সীমা বলেছিল, 'শশাংকবাবু, সুন্দরী মেয়ে দিলাম'।

শশাংক প্রথমে বুঝতে পারে নি। তবে ওর বিশেষ কৌতূহল ছিল না। ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে ধরেছিল শুধু।

—মেয়েটি বিষ খেয়েছিল। আত্মহত্যার কেস।

এবার শশাংক চমকে উঠল। আত্মহত্যা। ওর জীবনের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত একটি প্রশ্ন। অসীম উত্তেজনা নিয়ে নিজের টেবিলে এল। মানব-বসতি থেকে নির্দিষ্ট ব্যবধান রচনা করে লাশ ঘর। এরই সঙ্গে লাশকাটা-ঘর। প্রথমদিন এখানে এসে পূতিগন্ধে বমি হবার উপক্রম হয়েছিল। এখন সে-গন্ধ নাক-সওয়া। লাশ-কাটা ঘরের স্বতন্ত্র গন্ধই শশাংক ভালবাসে। এই ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে শশাংকর অফিস। একটা টেবিল, নড়বড়ে চেয়ার। একটা হোয়াট-নট আর একটা মরচে-পড়া স্টীল আলমারী। ডানদিকে একটা ছোট জানালা। বিকেলের বিক্লান্ত রোদ ঘরের ভেতর লুটোয়। বাইরে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। দু-একটা পাখীর ডাক এ-জায়গার নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে। শশাংক অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল ঝগড়ুর অপেক্ষায়। এতক্ষণে ফর্মালিনএর গন্ধ ভেসে আসে। কিছু পচা-গন্ধও। ঝগড় হয়ত মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়েছে। এরপর আরকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যাতে শরীরটা পুরোপুরি পচে না যায়। শশাংক

খাতাটা খুলে অপেক্ষা করে। নাম-ধাম-বর্ণনা তুলে রাখতে হবে। একটা বিড়ি ধরিয়ে জানালাপথে হিজলগাছের মাথায় দৃষ্টি সঞ্চালন করে। উন্মনা হয়ে যায় শশাংক। বুকের ভিতর অস্থিরতা। অধীর হয়ে পড়ে। ঝগড়ু এত দেরী করছে কেন? আরেকবার দৃষ্টিটা দরজার দিকে ফেলে ও আসছে কিনা দেখতে। আবার আকাশের দিকে তাকায়। ঘোলাটে আকাশে ওর চোখ-মন পথ হারিয়ে ফেলে। অনেক-কথা মনে পড়ে। ভীষণ ক্ষতে যেন কেউ খোঁচাতে শুরু করেছে। মানসিক আর্তির প্রকাশ ওর মুখে। চেয়ারের উপর ও এলিয়ে পড়েছে। ঘাড়টা পেছন দিকে। পা দুটো টেবিলের তলায় লম্বিত।

—বাবু এঠো লিখে নিন।

শশাংক নিঃসাড়। ঝগড়ু আবার বলে :

—ও শশাংকবাবু, ডেড বডিটা লিখে লিন।

শশাংক তাকায়। বুঝতে পারে ঝগড়ু এসেছে।

—কিরে ঝগড়ু, এত দেরী হল?

—বহুৎ ভারী লাশ হুজুর। আউর সাচ বাত কি জানেন, বহুত খুবসুরৎ ভি আছে। এ লড়কী ক্যয়সে মর্ গয়ে হুজুর?

শশাংক বসে থাকতে পারে না। এরা কেন মরে? এ-প্রশ্নের কি উত্তর? কোনও মীমাংসা আছে? শোভনা কেন মরেছিল? গলায় দড়ি দিয়ে শোভনা বেঁচে গিয়েছে। আর তিল তিল মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে শশাংককে। ওদের মৃত্যু চোখে লাগে। কিন্তু শশাংকর মৃত্যু সকলের অগোচরে, অলক্ষ্যে।

—বাবু আমার বিলটা জলদি করিয়ে দেবেন।

—দে কাগজটা।

দেখে দেখে লিখে গেল। কি লিখল সঠিক জানে না। ঝগড়ু চলে গেলে শশাংক উঠল। সন্ধ্যেও তখন জানালার পাশে মহাসমারোহে নেমেছে। হিজল গাছে পাখীদের ঘরে-ফেরার হৈ চৈ। ঘরের ভেতর ধূসর আলো। সুইচ্ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল শশাংক। তারপর এগিয়ে চলে। লাশ কাটা ঘর। চারটে লম্বা টেবিল। আনাচে কানাচে রক্তের দাগ। লাইজলের গন্ধ। শশাংক থমকে দাঁড়ায়। কোন টেবিলে কোন্ লাশ কাটা হয়েছে, মনে মনে হিসেব করে নেয়। তারপর আবার

চলতে শুরু করে। এরপর লম্বা অন্ধকার বারান্দা। লাশ কাটা-ঘরের আলোয় বারান্দার এই প্রান্তে আবছা আলো। ওদিকে গাঢ়তম অন্ধকার। শশাংক সেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকল। মনে হল, বহুক্ষণ এ-পথে ওর পরিক্রমা। এক সময়ে লাশ-ঘরের সামনে খোলা জায়গায় এসে পৌঁছয়। শশাংক হাত বাড়িয়ে সুইচ টেপে। সামনে দরজা। তারই পিছনে চৌবাচ্চাগুলি। আরকে ভাসমান কতকগুলো লাশ। এখন চারটে আছে। এ হিসেব শশাংকর মুখস্ত। দরজার ভিতরে পুঞ্জিত অন্ধকার লক্ষ্য করে শশাংকর শরীর কাঁটা দেয়। দরজা খুলতেই বাইরের আলো ভেতরের অন্ধকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পলাতক অন্ধকার দরজার বাইরে ধাওয়া করল। শশাংক আঁধারের স্পর্শে বিহ্বল। ভিতরের আলো জ্বালিয়ে দিল। এতক্ষণে সেই পরিচিত গন্ধে শশাংক স্বস্তি পেল। চার নম্বর চৌবাচ্চার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শশাংক। সমগ্র চেতনা একটি বোধের বৃন্তে সমাহিত করে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে নি ওর সমস্ত শরীর ঘামে আর্দ্র। স্নায়ুগুলো তির্ তির্ করে কাঁপছে। এখন পৃথিবীর অন্য কোন ঘটনা ওকে বিচলিত করতে পারবে না। কানের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটলেও ও নিশ্চল থাকবে। চৌবাচ্চার সামনে যেতেই ওর গলা চিরে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। মেয়েটি যেন এখনও মরে নি। এখনো মুখের লাবণ্য অটুট, চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। এখনো স্তনের বৃন্ত ঋজু। এখনো জঙ্ঘা-উরুর মসৃণতা ক্ষুণ্ন হয় নি। এখনো ওর সর্বশরীরে বাঁচার মত উপকরণের অভাব নেই। শশাংক চোখ বোঁজে। তারপর লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মেয়েটাকে উলটিয়ে দেয় আর অনন্য বংকিম গ্রীবা লক্ষ্য করে শশাংক ব্যথিত হয়। ঠিক তেমনি। শোভনার মত। সেও আত্মহত্যা করেছিল। ওকে সময় দেয় নি। সব অপরাধের দায়িত্ব ওর স্কন্ধে অর্পিত করে শোভনা দড়ির সঙ্গে ঝুলেছিল। সেই থেকে শশাংক মরছে। তিলে, তিলে, নির্দিষ্ট গতিতে ওর মৃত্যু। শোভনার সেদিনের চেহারা ভেসে আসে, যেদিন জানতে পেরেছিল শশাংকর জনন-ক্ষমতা নেই। শশাংকর দুই হাতের মধ্যে শক্ত কাঠের মত হয়ে গিয়েছিল। উন্মাদের মত মাথা খুঁড়ে বলেছিল,

—তাহলে আমার কি হবে? আমার শরীর? আমার মা হবার সাধ?

শশাংক বিরক্ত হয়েছিল ওর এমন উন্মত্ত আচরণে। তবে সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ও নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই শোভনাকে শাসন করতে পারে নি। শুধু বোঝানোর চেষ্টা করেছিল।

—দেখো শোভনা, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? চিকিৎসা করলে এ অসুখ সারতে পারে।

এ-কথা বলতে গিয়ে ও নিজে অপরিসীম লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেও, শোভনার প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে পারে নি। স্বীয় সততা বজায় রেখে আত্মহত্যা করেছে। আর শশাংক নিরাত্মীয়, নিরবলম্ব একা এ পৃথিবীতে ভেসে বেড়িয়েছে। এখন মনে হয়, শোভনা সায় দিলেও কিছু হ'ত না।

কতক্ষণ এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল মনে নেই। একা এ তন্ময়তায় মেয়েটির সঙ্গ-সান্নিধ্য উপভোগ করছিল। এই ঘরের পিছনে অ্যাশ-শ্যাওড়া গাছে শকুনির ডানা ঝটপটানির শব্দ ওকে সচকিত করল। আর তখনই লম্বা বারান্দায় কার জুতোর শব্দে শশাংকর ইন্দ্রিয়গুলো সতর্ক হয়ে উঠল। দূর থেকেই কে যেন নারী কণ্ঠে ওকে ডাকল।

—শশাংকবাবু কোথায় আপনি?

কথাগুলো নির্জন লাশ-ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে একটা বিচিত্র শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে শশাংকর কানে পৌঁছল। ভয় ভয় অনুভব শির্ শির্ করে শরীর। দুহাত দিয়ে দেয়াল চেপে ধরে। সমস্ত শরীর ঘামে ঝর ঝর করছে। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে।

তারপর শীলা হালদার ওকে নিয়ে এসেছিলেন। অফিসের প্রয়োজনে ওকে খুঁজে না পেয়ে এদিকে দরজা খোলা দেখে উনি চলে এসেছিলেন। তারপর আফিস-ঘরে বসে শীলাদি প্রশ্ন করেছিলেন—

—শশাংক সত্যি বলবে, ওখানে গিয়েছিলে কেন?

শশাংক কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলে।

—একটা নতুন লাশ এল, দেখতে গিয়েছিলাম।

শীলাদির সন্দেহ ঘোচে না।

—শুধু তাই? আমি খবর পেয়েছি তুমি প্রায়ই লাশ-ঘরে যাও।

শশাংক এবার হাসে। ক্রূর হাসি।

—হ্যাঁ। যাই।

—কেন ?

—আপনাদের চেয়ে ওরা আমার প্রিয়। ওদের সান্নিধ্যে—আমার আবেগ, আমার আনন্দ, আমার যন্ত্রণা।

শীলাদি বিস্মিত। শশাংক কথাগুলো বলতে গিয়ে হাঁফায়। মাথাটা টেবিলের উপর ঝুয়ে আসে। কপালের শিরাগুলো জেগে ওঠে। যেন এখুনি ছিঁড়ে পড়বে। মাথাটা ঘন ঘন পাশাপাশি দুলতে থাকে। শীলাদি কাছে এসে ওর মাথাটা ওঠান। কিন্তু ওর মাথা আবার ভেঙ্গে পড়ে। শীলা হালদার ওর নাড়ী টিপে ধরেন।

—একি শশাংক, তোমার জ্বর হয়েছে যে।

শশাংক কথা বলে না।

—চল, চল এখুনি হাসপাতালে চল।

ডাক্তার বোস দেখে বলেছিলেন- নিউরসিস। যে কোনও সময়ে নার্ভ ফেল করতে পারে। তুমি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও। কিছুদিন অ্যাবসলিউট রেস্ট।

সেই থেকে ও এই কটে শুয়ে রয়েছে।

এখন প্রতিরাতে ও শুয়ে শুয়ে ভাবে কখন নার্ভ ফেল করবে, কখন বেওয়ারিশ আমাকে ঝগড়ু লাশ-ঘরে নিয়ে যাবে। এই ভাবনায় ওর কোন মনোবেদনা নেই। নির্বিকার এমন চিন্তায় মগ্ন হতে পারে। শুধু শুধু ঝর্ণার কথা মনে পড়ে ও বেদনার্ত হয়। ওর প্রত্যয় বাস্তবে রূপায়িত হবে না, একথা ভেবেই শশাংক ব্যথিত হয়। ঝর্ণা আসে। একা নয়। শীলাদির সঙ্গে। উনি কুশলাদি প্রশ্ন করেন। ঝর্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দুচোখে অথৈ প্রশ্ন। শশাংক বোঝে। বুঝেই ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। শুয়ে শুয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর ভার চাপাতে চায় না। ভাবনা-চিন্তা নেই এমন কোনও জগতের অন্বেষায় নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু ভাবনা ওর ইচ্ছে মেনে চলে না। শোভনা, ঝর্ণা, নির্মল, শীলাদি সকলকে জড়িয়ে ভাবনা ওর মাথার ভিতরে বিপ্লব সৃষ্টি করে। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে ওঠে। কোন বিষয়েই সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা তৈরি করতে পারে না। মনে হয়, এখন নদীর ধারে সোনালী-সবুজ রোদ্দুরে ডুবতে পারলে ভাল লাগবে। নদীর জলে অবগাহন-স্নানে শরীরটা স্নিগ্ধ হবে।

ওদের থেকে অনেক দূরে আমবাগানে হাঁটলে ওর নিজেকে খুশী খুশী লাগবে। এমন ভাবনার সঙ্গে শশাংক সিদ্ধান্ত নিল, এই চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে নদীর ধারে যাবে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে শশাংক বিকেলের দিকে কোনওপ্রকারে নদীতীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কয়েক পা হেঁটেই বুকে হাঁফ ধরে। পা দুটো অবশ হয়ে আসে। রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। ঘাসের উপর শরীরটাকে এলিয়ে দিল। তারপর ঘুম। মনে হল, আবার আগের জীবন ফিরে আসছে। অনলস নিদ্রা-আসক্তি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। বোধহয় দু'দিন। দশ'দিনও হতে পারে। চোখ খুলে দেখে নাকের ভেতর দুটো রাবারের টিউব। অক্সিজেন। হাতে দুটো মোটা মোটা ছুঁচ। রক্ত দিতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সর্ব অঙ্গে ব্যথা অনুভব করল। আর দেখল ওরা সকলে দাঁড়িয়ে আছে। শীলাদি, সীমা, ডাঃ বোস আর ঝর্ণা। চোখ দুটোতে আজ প্রত্যয় নেই, পরিবর্তে শংকা ভর করেছে। শশাংকের হঠাৎ মনে পড়ল ও গাছতলায় শুয়েছিল। আর মনে পড়তেই লজ্জা পেল। আবার ওর চোখ দুটো বুঁজে আসে। ভাবল, আবার বাঁচতে হবে। শোভনার কথা, ঝর্ণার কথা, শীলাদির কথা ভাবতে। অসংখ্য মৃতদের হিসেব-নিকেশের জন্যও অন্তত ওকে বাঁচতে হবে।
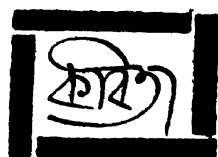
শেকস্‌পীয়ার থেকে

সনেট ১৮

কোনো বসন্তের দিন—সে কি তুল্য তোমার ? তুমি যে
সৌন্দর্যে মণ্ডিত আরো, আরো স্বচ্ছ, আরো শোভনীয়।
ফাল্গুনের ফুলকুঁড়ি দুরন্ত হাওয়ায় ঝরে নিজে—
জীবনে বসন্ত থাকে কতটুকু গৌরবে স্বকীয় ?

সোনার বরণ রৌদ্র, তপ্ত হলে সে-রৌদ্রের রঙ
ভীষণ বদল হয়, হয়ে যায় অচিরে তাম্রাভ।
সুন্দর যা-কিছু তার রূপান্তর আছেই, এবং
সকলি বদ্‌লায় যদি অনুরূপ আমরাও বদ্‌লাবো।

কিন্তু যে বসন্ত ওই অঙ্গটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর
করেছে—বদল তার নেই, সে যে চির-অমলিন।
এ কাব্যে যদ্যপি বাজে তোমার কথাই নিরন্তর
তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবে কোন্ মৃত্যু কোন্ দিন :

য-দিন নিশ্বাসবায়ু আছে মর্ত্যে, চোখে দৃষ্টি আছে—
যতদিন আছে কাব্য, ও-লাবণ্য ততদিন আছে।

অনুবাদ : সুশীল রায়

সনেট ১৯

সর্বগ্রাসী মহাকাল, জীর্ণনখ করো কেশরীকে,
মাতা বসুমতী তার প্রিয়তম সন্তানকে খাক,
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা তুলে নাও শার্দূলের হিংস্র মুখ থেকে,
অমর ফিনিক্স পাখী রক্তের ভিতরে পুড়ে যাক।

সুখে দুঃখে ভরো তুমি ছয় ঋতু চলে যেতে যেতে,
ধাবমান মহাকাল যা খুশি তোমার করো তাই,
বিপুলা পৃথ্বীকে নিয়ে ক্ষণস্থায়ী মহানন্দে মেতে
যা খুশি, একটি শুধু ঘৃণ্য কাজ কোরো না দোহাই ;

প্রিয়ের সুন্দর ভালে কালচিহ্ন এঁকো না এঁকো না
প্রাচীন লেখনী দিয়ে বলীরেখা কোরো না অঙ্কিত,
কালচক্র-আবর্তনে নাম তার কলঙ্কে ঢেকো না,
আগামীর কাছে রাখো সুন্দরের প্রতিমা সঞ্চিত।

অথবা যা পারো করো, বৃদ্ধ কাল,—বৃথা আস্ফালন,
আমার কাব্যের মধ্যে প্রেম পাবে অনন্ত যৌবন।

অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী

সনেট ৭৩

আমাতে প্রত্যক্ষ করো বৎসরের সেই ঋতুকাল
যখন হলুদ পাতা, গুটি কয়, নিঃশেষিতপ্রায়,
বৃক্ষের শাখায় শীতে কম্পমান—কালের কঙ্কাল
শূন্য জীর্ণ দেবালয়, নিষ্কূজন বিহঙ্গকুলায়।

আমাতে প্রত্যক্ষ করো গোধূলির সেই আলোছায়া
পশ্চিমে বিলীয়মান দিগন্তে যা সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়,
কালো রাত্রি অচিরাৎ—মৃত্যুরই দ্বিতীয় যেন কায়া—
যারে টেনে নিয়ে গিয়ে সব কিছু ঢাকে স্তব্ধতায়।

আমাতে প্রত্যক্ষ করো ক্ষীয়মাণ সেই ম্লান আলো
যৌবনের অগ্নিভস্মে এখনও যা ধিকিধিকি জ্বলে,
অন্তিম শয্যায় পাতা এজীবন ফুরালো ফুরালো,
দগ্ধ সেই অগ্নিদাহে যে-অগ্নিতে সব প্রাণ ফলে।

প্রত্যক্ষ করেছো তুমি, তাইতো তোমার ভালবাসা
আরো ভালবাসে তারে যে অচিরে ছেড়ে যাবে বাসা।

অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী

সনেট ৬২

আত্ম-আরতির পাপ জুড়ে থাকে আমার নয়ন ;
চিত্তের সর্বস্ব তা'র, অঙ্গে-অঙ্গে সে-গরল মাখা ;
কোনও তন্ত্রে লেখা নাই .স-পাপের নির্ণীত স্খালন,
আমার হৃদয়ে এতো দুর্নিরীক্ষ্য মর্ম তার আঁকা ।

সুধার পরমা ব্যক্তি, তা তো দেখো আমারই আননে !
নাই রূপ অমন সার্থক, নাই অর্থ কোনও অধিক গৌরবে,
আমি তো আপন সত্তা নিরূপিত করি সে-সম্মানে,
যার আত্যন্তিক মূল্যে সবারই উত্তম আমি ভবে ।

কিন্তু আয়নার কাঁচে দেখি যবে যথার্থ নিজেরে
পাটল কালের মারে তছ্‌নছ্‌, ছেঁড়া, ছারখার,—
তখন কী বৈপরীত্যে পাঠ করি আত্ম-আরতিরে,
আত্ম-দর্শনের অই প্রাজ্ঞজনে কিবা ব্যভিচার !

ওরে 'আমি' ! আমার বিষয়-নামে তোরই উপচার
জীবন্ত রোশ নাই তোর আমার জরার অলংকার ।

অনুবাদ : অমর ভট্টাচার্য

সনেট ১০৫

পৌত্তলিকতার অপবাদ দিওনা আমার প্রেমে
আমার প্রেমের পাত্র দেখায় না পুতুলের মতো
কারণ আমার সর্ব প্রশস্তি, সঙ্গীত নেমে আসে
একের জন্যেই, একদিকে, এখনো এবং সতত।

স্নেহময় আজ প্রেম, আগামীকালেও স্নেহশীল
এখনও অপরূপ, চমৎকারিত্বে সে চিরন্তন
তাইতো আমার কবিতা—সীমায় চির অনাবিল
প্রকাশভঙ্গিতে এক, বিভেদের করে নিরসন।

সৌন্দর্য মাধুর্য সত্য—এরা মিলে মোর সব যুক্তি
সুন্দর স্নেহ ও সত্য, কথার বৈচিত্র্যে আমি বলি
বৈচিত্র্য প্রকাশে নহে সর্ব পর্যবেক্ষণের মুক্তি
একের অন্তরে তিন বস্তু কাজের যোগ্য সকলি।

সৌন্দর্য মাধুর্য সত্য—বিচ্ছিন্ন রয়েছে বহুদিন,
একত্ব নেই ত্রয়ীর, আজও নয় এককে আসীন।

অনুবাদ : শ্যাম রায়

শেক্‌স্‌পীয়ারের তিনটি নাটক প্রসঙ্গে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

আত্মঘাতী

কালো, ভীষণ কালো দুহাত দেসদেমোনার দিকে
বাড়িয়েছিলো।
অন্তবিহীন গোপন স্বপ্নটিকে
রুদ্রগভীর চোখের ছায়ায় জটিল মনসিজে
হত্যা করেছিলো তাহার নিজের রক্তে ভিজে।

[ওথেলো]

অপঘাত

পিতার নাম পলোনিয়াস, কন্যা ওফেলিয়া
শরীরে তার ফোটায় ফুল শতেক অ্যাজেলিয়া,
তার ছিলো এক লজ্জা ছিলো শুভ্র যুবরাজ—
রুধিরে যার নষ্টকুটিল এল্‌সিনোরের ক্রীয়া ;

কোথায় ডোবে কোমল জলে ঠাণ্ডা ওফেলিয়া !
কোথায় হত দুঃখদাহে হায় সে যুবরাজ !

[হ্যামলেট]

আঘাত

বাঁকা ষড়যন্ত্রে তিক্ত ভয়ঙ্কর দাবানল জ্বলে উঠেছিলো ব'লে
অজান্তেই বক্ষে তার বাসা বেঁধেছিলো শয়তান—
এবং সন্ত্রাসচক্রে জনতার আংশিক উত্থান
দুরন্ত ছুরিকা হেনে স্তব্ধ করেছিলো তাকে রোমে, ক্যাপিটলে।

তারপর বিষাদসিন্ধু—ফিলিপ্পিতে অন্ধতম ম্লান
ছায়া ফেলেছিলো মাঠে, ব্রুটাসের রক্তের পল্বলে।

[জুলিয়াস সীজার]

মরা মাছের মুখ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন বিকেলবেলা। বর্ষার জল থৈ থৈ করছে মাঠে। জোটন গোপাট ধরে জল ভাঙতে থাকল। সে কোথাও জলে সাঁতার কেটে, কখনও জলজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে অথবা ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে যখন দেখল সুপারী বাগানে একটাও সুপারী পড়ে নেই, যখন দেখল ঘাটে একটা তে-মাল্লা নৌকা বাঁধা এবং ছইএর নীচে দুই মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ঠাকুর বাড়ী মেশান এসছে এমত ভেবে খুব খুশি। মামা মামীদের ঘরে কুটুম এল। সামনে ঠাকুর ঘর, পাশে জবা ফুল গাছ— এ-সব কিছুই স্পর্শ করতে নেই—। জোটনের একথা জানা বলে সে ঠাকুর ঘর থেকে দুহাত দূরে দাঁড়াল। জবা ফুল গাছটার নীচে জোটনের শরীর। এখনও খুব শক্ত সমর্থ মনে হয় দেখলে। জোটনের শরীর থেকে জল পড়ছিল। সে এই জবা ফুলগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে কাপড়ের জল চিপল। তারপর এদিক ওদিক লক্ষ্য করে যখন দেখল গ্রামের পথে কেউ উঠে আসছে না অথবা তালের বড়ার গন্ধ সর্বত্র তখন সে তার ভুড়ে শাড়ীটা ভাল করে নিংড়ে নিল। তখনও তালের বড়ার গন্ধ সর্বত্র। চিড়ে কোটার শব্দ আসছে। মামাদের এখন ভাদ্রমাস। ভিটা জমিতে আউশ ধান এবং পাকা ধানের আঁটি তোলার সময় জোটন কিছু ধান চেয়ে নিয়েছে। জোটন ভাবল অবেলায় জল ভেঙ্গে খোদার কুদরতে নসিবটা খুলে গেল।

সে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। দেখল, সোনামামা পশ্চিমের ঘরে তক্তপোশে বসে আছেন। একটা মোটা পুঁথি পড়ছেন তিনি। পাছ দুয়ারে মামীদের সঙ্গে মেমানদের গলা পেল জোটন। জোটন সোনা কর্তাকে আদাব দিল। বলল, সোনা মামা কবে আইছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ মুখ তুলে দেখল আবেদালীর দিদি জোটন। জোটনের শরীরটা একটু রুগ্ন দেখাচ্ছে, চুল জোটনের নেই বললে হয় এবং শনের মত। মুখের কমনীয়তা নেই। ওর শরীরের গঠনটা কেমন যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। গালে মেসেতা সুতরাং মুখটি কুৎসিত দেখাচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বলল, কিরে জুটি তুই ?

—হ মামা আমি। অহন ত আবেদালীর কাছেই আছি।

- এইবার অ তরে তালাক দিল।

—হ মামা। কিন্তু নিৰ্ব্বেংশায় না দিল পোলা, না দিল এক কানি ত্যানা।

—পোলা না দিছে ভাল করছে। আইনা তুই পোলারে খাওয়াইতি কি?

জোটন সেটা ভাল করেই বোঝে বলে অন্য কথা আর বলল না। সোনা কর্তা বড় পুঁথিতে আবার মন দিয়েছেন। চশমার ভিতরে সোনা কর্তার মুখে দেখে বলতে ইচ্ছা হল, সোনা মামা আমারে একটা পুরান দুরান যা হয় দেইখা শুইন্যা ছান। কিন্তু বলতে সাহস করল না। তিনবারের তালাক এই শরীরকে যেন দুর্গন্ধময় করে রেখেছে, সুতরাং সোনা কর্তা চোখ কুঁচকে বললেন, আবার তর পাগলামি আরম্ভ হইছে। এইটা ঠিক না। সুতরাং জোটন আতাবেড়ার পাশ দিয়ে পাছ-দুয়ারে ঢুকে ডাকল, বাড়ীডা ত গম গম করতাছে গো নানী।

এই ভিতরের উঠোনটাও বেশ বড়। ধনমামী বড় মামী চিড় কুটছে। কিছু কলা পাতা কেটে রেখে গেছে ঈশান। সন্মান্দী থেকে মামাদের চাচাত ভাইয়ের বৌরা এসেছে—জোটন সকলকে চেনে না। যাদের চিনল তাদেরই বলল বড় নাওডা দেইখাই বুঝছি—আপনেরা আইছেন। শেষে কেমন বিষণ্ণ গলায় বলল, আমার বড় সখ করে গ ঠাইরেন আপনেগ মত মেমান হৈয়া কোন দূরদেশে চইলা যাই।

জোটনের এইসব কথায় সকলে হাসল।

জোটন বলল, আপনেরা হাইসেন না। বড় কষ্ট শরীরের। তারপর কি ভেবে ধনমামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি যখন আইছি তখন আপনেরা ইট্টু জিড়ান। বলে সে কাহাইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং ধনমামীর হাত থেকে আল্লা করে ছিয়াটা নিয়ে চিড়েতে দু তিনবার ঠুকে ঠুকে পাড় দিল। চিড়েগুলি ভাল হচ্ছে না দেখে বলল, ধানটা কম ভিজছে ধনমামী। আর এট্টু ভেজলে ভাল হৈত।

বুড়ো ঠাকরুন রান্নাঘরে তাল চালছেন নিবিষ্টমনে। তালের গোলা কাপড়ে বাঁধা। কাপড়ের পুঁটলীটা কাঠের ধন্নাতে ঝুলছে এবং রান্নাঘরের এক কোনায় পবন কর্তার বৌ তালের মালপোয়া ভাজছে। জবা ফুল গাছের নীচে জোটন যে গন্ধের তাড়নায় এই বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকে গেছিল এখন সেই বস্তুর পরিমাণ দেখে খুশী। সারাদিনের সংগ্রাম অথচ কোন উপার্জন নেই এবং

এই বিকালে চিড়ে কোটার শব্দে, তালের ভাজা ভাজা গন্ধে বেঁচে থাকার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। বড় বৌ, ধন বৌ, এমন কী যারা আত্মীয় কুটুম এসেছেন তারা পর্যন্ত বুঝল—জোটন এই পরিশ্রমের বিনিময়ে এক খোলা চিড়ে এবং কিছু তালের বড়া পাবার আকাঙ্ক্ষা করবে।

জোটন আপনজনের মত এখন কাজগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে করবে। জোটন চিড়ে কুটছিল। চিড়ে অথবা ভিজে ধান ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লে জোটন খুঁটে খুঁটে তুলবে। কাহাইলের নীচে কলাপাতা দেবে বেশী। তাতে কাহাইলটা নড়বে না। চিড়ে চলকে পড়বে না পাশে।

সে আশেপাশের জায়গা ঝেড়ে ভাজা ধানের জন্য বসে থাকল। খোলাতে ধান ভাজছে হারান চন্দের বৌ। সে হারান চন্দের বৌকে উদ্দেশ্য করে বলল, বৌদি ধানটা কম ভাইজেন।

জোটন অতি অল্প সময়ে ঠুকে ঠুকে এবং নেড়ে নেড়ে খোলার ধানের চিড়ে কুটে সকলকে কুলায় ছড়িয়ে দেখাল। এতক্ষণ বড় বৌ এবং ধন বৌ চিড়ে কুটে বেতের ঢাকীতে রেখেছে। জোটন কিন্তু অন্য একটা বেতের ঢাকীর জন্য অনুরোধ জানাল। ওর চিড়ে বেশ বড় হয়েছে এবং মিহি। বুড়ো ঠাকরুন বললেন, অরে একটা বেতের ঢাকী ছাও বড় বৌ।

ধনবৌ ফিস ফিস করে বলল, হৈছেল জুটি, এক লগেই রাইখ্যা ছা।

—ভাল চিড়াডা মামী ……।

—তর চিড়া ছাখলে ঠাইরেণ আবার আমারে দিদিরে বকব।

—বকব ক্যান? সব মাইনষের হাতে সব জিনিষ কি সমান হয়!

পল্টু কি জন্য এদিকে আসতেই জোটন ডাকল, লও ঠাকুর, এক মুঠ চিড়া লও। জোটনের এই প্রভুত্ব করার স্পৃহাটুকু সকলেরই ভাল লাগল। সে নিজের কোটা চিড়ে কুলাতে ঝেড়ে একমুঠো চিড়ে পল্টুকে দিয়ে বলল, ঠাকুর আমারে দুইডা কাচা গুয়া দিবা ত?

পল্টু বলল, দিমু। যাওনের সময় লৈয়া যাইস।

—ঠাকুরের আমার সুন্দর বৌ হৈব। জোটন আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে কথাটা বলল।

—তর নাকি আবার হাঙ্গার সখ হৈছেল জুটি, পবন কর্তার বৌ কি জন্য বাইরে এসে এমত প্রশ্ন করল।

—অঃ আল্লা হেইডা এতদিনে জানলেন। কিন্তু পাইতাছি কৈ?

—তর ক্ষেমতা আছে কৈতে হৈব।

—কি যে কন আপনেরা। সরমের কথা আর কইয়েন না। এইডা গতরের কথা। আপেনর-অ আছে, আমার-অ আছে। আপনে সুখ পান কথা কন না, আমি সুখ পাই না কথা কই। এইসব বলে জোটন চিড়ে কুটতে থাকল ফের। ওর মুখে একরকমের শব্দ, শব্দটা কোড়াপাখীর ডাকের মত সে নিজের হাতেই মাঝে মাঝে চিড়ে আল্টে দিচ্ছিল। ছিয়াতে ঠুকে ঠুকে যখন দেখল ধানের রঙ চিড়ের মত (যখন দেখত চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা চিড়েগুল উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তখন একটু বিশ্রামের ভঙ্গীতে ছিয়ার উপর ভর করে পবন কর্তার বৌকে বলল, ঠাইরেনের শেষ কথা কয়টা শুনতে পাইলাম না।

পবন কর্তার বৌ রান্না ঘরের ভেতর থেকে বলল, আর শুনতে হৈব না—যা করতাছস কর।

ভাদ্র মাস বলেই এত গরম এবং তালের পিঠা গন্ধ ছড়াচ্ছে গ্রামময়। হারান চন্দের বৌ ধান খোলাতে ভাজছে, শুকনো কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন উনুনে বুড়ো ঠাকরুন। সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। জোটন চিড়ে কুটতে কুটতে সব লক্ষ্য করছিল। বড় বৌ জল আনতে গেছে কুয়োতে। জোটন একটু জল চাইল। আর এ সময়ে জাম গাছ থেকে একটা ইষ্টিকুটুম নোংরা ফেলল। জোটন সরে গেল. কাহাইলটা সরিয়ে নিল। দুধারে বস্তা পেতে নতুন করে নিজের জায়গা নির্বাচন করে পাখীটার দিকে হাত তুলে বলল, মামী গ একটা ইষ্টিকুটুম পাখী।

রান্না ঘরে পবন কর্তার বৌ এবং ওরা সকলে, সুতরাং মুখ ফসকে কথাটা ধনবৌ বলে ফেলল না অথবা বলতে পারল না—কুটুমের ঠ্যালা আর না, ইষ্টিকুটুম পাখীটারে উড়াইয়া দ্যা জুটি। সারা বর্ষাকালে কুটুম আর কুটুম। দিন নাই রাইত নাই আইতাছে আর যাইতাছে। অথচ বুড়ো ঠাকরুনের বড় সখ কুটুমের। কোন কুটুম কোন জিনিস খেতে পছন্দ করেন বুড়ো ঠাকরুনের সব মুখস্থ। জোটন এই আবেলায় বুড়ো ঠাকরুনকে ইষ্টিকুটুম পাখীটা দেখাতে চাইল। যেন বলার ইচ্ছা পাখীটা যখন ডাকতাছে তখন নানী পাটি সাপটার গুড়া করেন, মেমান আবার আইতে পারে।

এ-সময়ে মেঘনাতে এবং পদ্মাতে সব ইলিশের ঝাঁক উঠে আসবে। জোটন জানত, এ-সময় বুড়ো ঠাকরুন কুটুমের জন্য ভাল মন্দ খাবার অথবা নাইয়ড় নাইয়ড়ীরা ঘুরে বেড়াবে ঘরময়—উঠোনময় সব শিশুদের কোলাহল, ঘাটে ঘাটে

নৌকা বাঁধা··এই এক ধরনের দৃশ্য এবং জোটন দেখল হায়ান পাল নৌকা থেকে এক গণ্ডা ইলিশ নামাচ্ছে। বড় বড় ইলিশ—রূপোর মত উজ্জ্বল রং অবেলার রোদে চিক চিক করছিল। জোটন ইলিশ মাছগুলো দেখে চোখ নামাতে পারছেনা।

বুড়ো ঠাকরুন ঘটনাটা লক্ষ্য করে বললেন, তুই রাইতে খাইয়া যাইস জুটি।

– নানী গ রাইত হৈব।

—হৈল ত কি হৈল। তুই ত কত রাইত কৈরা যাস।

জোটন অন্য কথা বলল না। ওর পরনের ডুরে শাড়ীটা এতক্ষণ পর প্রায় শুকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ জোটনকে এক খোলা চিড়া দিল খেতে। পল্টু দুটো সুপারী এনে দিল। বুড়ো ঠাকরুন কিছু তালের বড়া দিলেন খেতে তারপর বললেন, তুই ইট্টু ব। জিডা। মাছটা রান্না হৈলেই তরে খাইতে দিমু।

জোটন খেতে বসে বেশ করে খেল, চেটেপুটে খেল। বড় যত্নের সঙ্গে ভাত কটি খেল। শিঙনাথ বেগুনের সঙ্গে ইলিশের স্বাদ এবং আউশ ধানের শক্ত মোটাভাত জোটনকে এই পরিবারের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অভিভূত করছে। বুড়ো ঠাকরুন, বড়বৌ, ধনবৌর সকলের উদারতা যেন এই পরিবারের পাগল ঠাকুরের মত। এই ভোজনের সঙ্গে রাতের জ্যোৎস্না এবং এক পাগল মানুষের অস্তিত্ব, বুড়ো কর্তার সাত্বিক ধারণা, ভূপেন্দ্রনাথের সততা সব মিলে জোটনকে এক নিঃসঙ্গ সুখ দিচ্ছে। এবং কতকালের মেমান যেন এই-সব পরিবার। জোটন শিশু বয়সের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করে কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ছে। কাতিক পূজার দিনে সে ভোর রাতে এসে বসে থাকত শ্রীঘটের জন্য। আরও মধুর সব ঘটনার কথা স্মরণ করে চোখ তুলতেই দেখল, সামনে বড় বৌ। সে বড় বৌকে উদ্দেশ্য করে বলল, মামীগ অনেকদিন পরে দুইডা ভাত প্যাট ভৈরা খাইলাম। এই খাওয়নের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকব।

বড় বৌ ওর দুঃখের কথাগুলি শুনে বলল, তুই যে কৈলি কোন এক দরগার ফকীরসাব তরে নিকা করতে চায়।

– কী যে কন মামী! খোয়াবাত কত দ্যাখলাম গ মামী কিন্তু আল্লাতালার মর্জি না হৈলে আপনে আমি কি করমু।

— ক্যান আবেদালী যে কৈয়া গ্যাল ফকিরসাব আইছিল।

—আইছিল, প্যাট ভৈরা পানতা গিলছিল। গিল্যা আমারে কয় কি, আপনে থাকেন, আমি কোরবান সেখের সিন্নিতে যামু। ফিরনের সময় আপনারে লৈয়া ফিরমু। এই বৈল্যা নিরুদ্দেশায় আইজ-অ গ্যাছে, কাইল-অ গ্যাছে মামী।

—যখন কৈয়া গ্যাছে তখন ঠিকই আইব একদিন।

আপনাগ মেহেরবাণী, জোটন এই বলে কলাপাতায় সব এঁটোকাটা তুলে জামগাছটার অন্ধকার অতিক্রম করে বড়ঘরের দেয়ালের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। গন্ধপাদলের ঝোপের ওপাশটায় কলাপাতা নিক্ষেপ করে সে দূরের মাঠ দেখল। জ্যোৎস্না রাত বলে এই ঝোপ-জঙ্গল দূরের মাঠ, সবুজ ধানক্ষেতের অস্পষ্ট ছবি সবই কেমন রহস্যময়। সে হিসেব করে বুঝল প্রায় দু'সাল হবে গতর আর আল্লার মাসুল তুলছে না। বিশেষ করে এই রাত এবং ঝোপজঙ্গলের ইতস্তত অন্ধকারের ছবি অথবা আকণ্ঠ ভোজনে এক তীক্ষ্ণ ইচ্ছা জোটনকে বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে।

সে বড় মামীর নিকট থেকে একটু পান চেয়ে খেল। কাঁচা সুপারী একটা আস্ত চিবাতে চিবাতে সুপারী বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। এক মন্ত্রবৎ ইচ্ছা-শক্তি এই বাগানের ভিতর কিছুক্ষণ রেখে দিল যদি একটা কাঁচা সুপারী টুপ্... এই শব্দে ঘাসের বুকে ...আহা এই সময়ে বাদুড়েরা আসুক, গাছের মাথায় শব্দ হোক ...কিন্তু দীর্ঘ সময় ধ'রে ইতস্তত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ব্যতীত অন্য কোন শব্দ যখন শুনতে পেল না, যখন একমাত্র কাঁচা সুপারীর রস ক্রমশ জোটনের শরীরকে মাতাল করছে তখন অন্ধকারের ভিতর জলে একটা গোসাপের মত জোটন ভেসে গেল।

ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে জোটন দেখল নরেন দাসের বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছে। পুবের ঘরে কোন তাঁতের শব্দ হচ্ছে না। জ্যোৎস্না রাত— জলের উপর দিয়ে সব পাখীরা ভেসে যাচ্ছে। সুতা পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। সুতরাং নরেন দাস রাতে তাঁত চালায় না। জোটন এই জ্যোৎস্নায় সুতা ভরতে পারছে না নলীতে সে-জন্য দুঃখ। জোটন অনেক কষ্টে একটা চড়কা কিনে যখন বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছিল, যখন ভাবল হিন্দুবাড়ীর বৌদের মত ছোট একটা কাঁসার থালা কিনে বড়লোক হবে এবং যখন সুতোর মোড়া দু'পয়সা থেকে সহসা চার পয়সা হয়ে গেল এবং একজন ফকীরকে পোষার মত

ক্ষমতা হচ্ছে তখন কিনা বাজারে সুতার আকাল, বাজারে সুতা পাওয়া যাচ্ছে না।

নরেন দাসের বোন মালতী বারান্দায় বসে শোভাকে ভাত খাওয়াচ্ছে। একটা গাছার উপর লম্ফটা জ্বলছিল। বারান্দা পার হলে উঠোন। শরৎকাল বলে আকাশ স্বচ্ছ, জ্যোৎস্নায় উঠোনটা সাদা হয়ে গেছে অথবা গাছে, পাতায় পাতায়, পাখীদের আর্তনাদে পর্যন্ত সাদা রঙ যেন। জোটন জল কাটছিল, খুব ধীরে অনেকটা সাঁতারের ভঙ্গীতে জল কেটে যাচ্ছিল। এই গরমে জলের ঠাণ্ডাটুকু, আকাশের স্বচ্ছন্দ ভাবটুকু এবং পূব দিক থেকে বড় চান্দের হাসি-মুখটুকু জোটনের ভালবাসার ঘর তৈরী করছিল। সে ঘুরছে ফিরছে জলের ভিতর এবং ক্রমশঃ গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আকণ্ঠ খেয়ে শরীরে কত সব সখ জাগছে। দূরের মাঠে একটা মাত্র আলোর ফুলকি এবং চারিদিকে শুধু জল। আশেপাশে কোন ধানক্ষেত ছিল না, সব পাটের জমি। পাটা কালি হয়ে গেছে। দীঘির মত স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করছে চারিদিকে। স্বচ্ছ জলে জোটন শরীরের উত্তাপ ঢালছিল—যেন কতদিন গাজীর গীদেয় গায়ানদারের মত সূর্যের উত্তাপ না পেয়ে অবসন্ন। সে এ-সময় এক মুখ জল নিয়ে আকাশের দিকে ছেড়ে দিল। তারপর বলল, আল্লা তর ছুনিয়ায় তবে আমার কি কামডা থাকল ক দিনি!

মাঝে মাঝে জোটনের ডুব দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু এই রাতে চুল ভেজালে সারারাত উকুনের কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণার কথা ভেবে জোটন ডুব দেওয়া থেকে বিরত থাকল। আকাশে আলো রয়েছে, জলে শাপলা শালুক রয়েছে আর মাঠ শেষে আম জামের ছায়া প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে—এই দেখতে ভাল, শাপলা ফুলের মত সে জল থেকে মুখটা তুলে দুটো মান্দার গাছ অতিক্রম করতেই দেখল গোপাটের বটগাছটার নীচে একটা হ্যারিকেন এবং একটি নৌকার মত কিছু অবয়ব পাচ্ছে। সে লজ্জায় কেমন বিব্রত হয়ে গোপাটের জলজ ঘাসের ভিতর পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল—কারণ জলে শব্দ হচ্ছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছে একটা বড় মাছ অল্প জলে পড়ে কাতড়াচ্ছে। সুতরাং জোটন দেখল নৌকাটা কে যেন টেনে টেনে এদিকেই নিয়ে আসছে। সে যেন গোপাটে বড় মাছটা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। জোটন তাড়াতাড়ি গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে জলজ ঘাসের অন্ধকারে আশ্রয় চাইল —কিন্তু পেল না। ওর মুখের কাছে লণ্ঠন তুলে মনজুর বলছে তখন, জোটন তুই!

জোটন শরমে চোখ বুঁজে ফেলল, হ আমি!

—কৈ গ্যাছি লি ?

—গ্যাছিলাম ঠাকুরবাড়ী। পথ ছাড় যাই।

মনজুর জোটনের শরীর দেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সে মুখ ফেরাল না, অথচ বলল, আমি আবার ভাবলাম একটা বড় মাছ বুঝি চাড়ি মারতাছে।

—আর কিছু ভাবস নাই ত ?

--আর কি ভাবমু। বলে সে নৌকাটার উপর উঠে বসল।

—ক্যান অন্য কিছু ভাবন যায় না ? তুই ইদিকে ক্যান। এবার জোটন চোখ খুলল। ভয়, সংকোচ সব কেটে গেছে এবং দেখল মনজুর খালি গায়ে, পরনে অত্যন্ত মিহি গামছা তাও জলে ভিজে খানিকটা উপরের দিকে উঠে আছে এবং মুখ অন্যদিকে ফেরানো। জোটনের ভারি হাসি পেল।—তর ত পয়সা অনেক, একটা বড় গামছা কিনতে পারস না।

মনজুর বলল, তুই যা দিনি।

—যামুনা ত। কি করবি ?

—কি আবার করমু। সে তার এই উপস্থিতির জন্য অজুহাত দেখাল। কলল, হাইজাদী গ্যাছিলাম অষুধ আনতে। ফিরতে রাইত হৈয়া গ্যাল অনেক। গোপাটে আইলাম চাঁইগুলি দ্যাখতে। আইয়া দ্যাখি তর এই কাণ্ড। তর লগে দ্যাখা হৈব জানলে একটা তফন পৈরা আইতাম।

মনজুর, জোটনের সমবয়সী। এবং কিছু কিছু শিশু বয়সের ঘটনা উভয়ে এ-সময়ে স্মরণ করতে পারল। একদা এইসব পাটক্ষেতের আলে আলে ঘুরে প্রথম যৌনজীবনের প্রেরণা উভয়ে এখানেই লাভ করেছে। জোটন সেইসব স্মৃতির কথা স্মরণ করতে চাইল অথচ এক সংকোচবোধে ওরা পরস্পর কিছু উচ্চারণ করতে পারল না। দু'সালের অধিক এই শরীর জলে জলে খা খা হচ্ছে। জোটন ভয়ানক বিষণ্ন গলায় এবার বলল, পথ দ্যা, যাই।

—তরে ধৈরা রাখছি আমি!

জোটন এই জল দেখে, রাতের জ্যোৎস্না দেখে এবং নির্জনতার জন্য জল কেটে যেতে পারল না। শরীর ওর অবসন্ন। জলজ ঘাস সকল ওর শরীর পঁচিয়ে রেখেছে এমত এক ভাবের জন্য সে জলের উপর ব্যাঙের মত ভেসে উঠল। বেহায়া নির্লজ্জ ভঙ্গীতে বলল, আসমানের চান্দের লাখান তর মুখখানা।

কিন্তু দেইখা ত মনে হয় অমাবস্যার আনধার রাইত—য্যান শুকাইয়া গ্যাছে।

—হ শুকাইয়া গ্যাছে! তরে কৈছে!

—কৈছেনা ত, মুখ ঘুরাইয়া আছস ক্যান।

মনজুর ওর রুগ্ন বিবির মুখটা স্মরণে এনে কিঞ্চিত বিব্রত হয়ে পড়ল। দীর্ঘদিন বিবির রুগ্ন শরীর ওর ইচ্ছার তাড়নাতে জল ছিটাতে পারে নি। শুধু মনজুর জ্বলেছে, জ্বলেছে। একটা নিকাহের যে সখ ছিল-না অথবা মনজুর বিবিকে যথার্থই ভালবাসে—সবই সত্য। সুতরাং মনজুর এবার বলল, পারবি আনধার রাইত আলো করতে? এবং মনজুর মুখ ফেরাতেই জোটন গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখল। সামনে পিছনে জলজ ঘাস—বেশ আব্রুর সৃষ্টি করেছে। জোটন এই জলজঘাসের ভিতর মনজুরকে নিয়ে পলান্তি খেলতে চাইল। আর মনজুর তখন শক্ত দুই হাতে জলজ ঘাসের ভিতর থেকে জোটনকে পাটাতনে তুলে আনল।

কিছুক্ষণ পর পাটক্ষেতের ফাঁক দিয়ে কেমন একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। জোটন শুনতে পাচ্ছে, মনজুর শুনতে পাচ্ছে। নৌকার উপর কিছু পোকা উড়ছিল। ধানের জমিতে চাঁদের আলো বড় মায়াময়, সুখ অথবা আনন্দ এই পাটাতনে। সব দুঃখ ভেসে যাচ্ছিল জলে, সব উত্তাপ চাঁদের আলোর মত গলে গলে পড়ছে। ইচ্ছার সংসারে মনজুর পুতুল সেজে বিবির মরা মুখ দেখতে দেখতে বলল, ক্যাডায় কান্দে ল?

—মনে হয় তগ বাড়ী থাইক্যা আইতাছে।

—তবে বিবিডা বুজি গ্যাল।

জোটন দেখল পক্ষাঘাতগ্রস্থ রুগীর মত মনজুরের মুখ। সব উত্তাপ এখানে ঢেলে দিয়ে মনজুর যেন যথার্থই এখন শোকজ্ঞাপনের নিমিত্ত চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে নৌকাটা বাইতে থাকল।

জোটন জল ভেঙে যাচ্ছে আর পুটলীটা টিপে টিপে দেখছে—চিড়াগুলি পানীতে আবার ভিজা গ্যালনাত!

সু-সম খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

নীরদচন্দ্র রায়

জাতিসঙ্ঘের অন্তর্গত 'নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থা' বলেছে, "স্বাস্থ্য কেবলমাত্র রোগশূন্যতা বা দৌর্বল্যহীনতা নয়, স্বাস্থ্য শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলকারক ও সুখপ্রদ একটা অবস্থা বিশেষ।" বেশ বোঝা যায় সংজ্ঞাটির লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে। ভোগের বস্তুসামগ্রীর পাহাড়সৃষ্টি যেন আর 'সব পেয়েছির দেশে'র সবটা নয়, আরও কিছু চাই। তাই সুখের প্রাচুর্যের মধ্যেও মানসিক শান্তি আর সামাজিক মঙ্গলের কতটুকু প্রাপ্তি ঘটেছে—এ বিষয়ে জেগেছে দ্বিধাকণ্টকিত প্রশ্ন। পাশ্চাত্য মনের এ প্রশ্নটিই উপরি উক্ত সংজ্ঞানির্দেশে প্রতিফলিত হয়েছে। ৪০০০ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশেই চরক কিন্তু এ প্রশ্নটির মীমাংসা করে গেছেন। অবশ্য চরকের বহু পূর্বে শুশ্রুথও এ প্রশ্ন মীমাংসায় একই সিদ্ধান্ত করে গিয়েছিলেন।

চরকসংহিতায় আছে "অন্নই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। বর্ণের প্রসাদ, সুস্বরতা, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বল, মেধা সমুদয়ই অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" আহারের এই নয়টি ফলশ্রুতি হচ্ছে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শুধু মাত্র "তদিন্ধনাৎ হ্যন্তরগ্নেঃ স্থিতিঃ" (চরক), "তৎ সত্ত্বমূর্জ্জযতি" অর্থাৎ অন্তরাগ্নির স্থিতিকারণ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যই কাষ্ঠস্বরূপ (fuel), এই অন্তরাগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হওয়াতে জীবসত্ত্বা অনুপ্রাণিত হয়।—এ বলেই স্বাস্থ্যের কথা শেষ হয়ে যায় নি। মন, আত্মা, শরীর—তিনটিরই উন্নতি চাই। চরকসংহিতা বলে, মন আত্মা শরীর এক একটি দণ্ড। এই তিনটি দণ্ডের সংযোগে যে ত্রিদণ্ডী (Tripod stand) তা'তেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পুরুষ। এখানে পুরুষের সাম্যাবস্থাটি সহজেই অনুমেয়। যে কোন একটি দণ্ডের অভাব হলেই পুরুষের স্থিতিসংকট দেখা দেবে।

এই 'পুরুষের' কর্ত্তব্য হচ্ছে, মন বুদ্ধি পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখা এবং 'ইহ-পর'—উভয়লোকের হিতকামনা করা। উক্ত কর্ত্তব্যপালনের উদ্দেশ্যে পুরুষকে তিনটি বিষয় সর্বতোভাবে অন্বেষণ করতে হবে, যথা প্রাণৈষণা, ধনৈষণা এবং পরলোকৈষণা। প্রথমেই প্রাণৈষণা, তারপর

আসে ধনৈষণা। প্রাণরক্ষার পর ধনোপার্জন। ধনোপার্জনকেও চরক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

"উপকরণহীন নির্ধনের অপেক্ষা পাপী আর কেউ নেই। যেহেতু উপকরণহীন নির্ধনের দীর্ঘায়ুলাভ হয় না, অতএব উপকরণগুলির অন্বেষণ অর্থাৎ ধনোপার্জনের জন্য সবিশেষ যত্ন করবে।" নির্ধনতা পাপ, যেহেতু স্বাস্থ্যহীনতা পাপ। স্বাস্থ্যহীনতা পাপ, যেহেতু স্বাস্থ্যহীন আত্মার উন্নতি করতে অক্ষম। জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আত্মার উন্নতিসাধন। উক্ত সামাজিক পাপমোচনের উপায়টিও নির্দিষ্ট হয়েছে চরকসংহিতায়। সবশেষে আসে পরলোকৈষণা। জীবনযাপনের ভিত্তিটি পাকাপোক্ত হয়ে গেলে পর বাসনার আগুনে আর ঘৃতাহুতি নয়। এবার পিছুটান—নিবৃত্তি—অনাসক্তি। জীবনে তুষ্টি ও অনাসক্তিই হচ্ছে অভিলষিত শান্তির ভিত্তি। সেই শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে তুষ্টি ও অনাসক্তির সিংহাসনে বসে শুরু হয় পরলোকৈষণা বা অন্তর্মুখী হয়ে ঈশ্বরচিন্তা। মন আত্মা শরীর এই ত্রিদণ্ডসমন্বিত পুরুষ ত্রিধা অন্বেষণের দ্বারা জীবনে শান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে নিজের মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরকে পাওয়ার চেষ্টা করে। এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিদ্‌দের চিন্তাধারা। ব্যক্তি এখানে 'স্বস্থ'। এই 'স্বস্থের ভাবটিকেই ভারতের ঋষিরা বলেন 'স্বাস্থ্য'।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে চরকোক্ত স্বাস্থ্য সংজ্ঞাটি অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়। সন্দেহ নেই, নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার স্বাস্থ্য সংজ্ঞায় মানসিক শান্তির কথাটি চরকোক্ত স্বাস্থ্যসংজ্ঞায় পূর্ণতমরূপে বিধৃত হয়ে আছে। এখানে অবশ্য একটি গুরুতর প্রশ্নও রয়ে গেছে। নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার স্বাস্থ্য সংজ্ঞায় ঈপ্সিত মানসিক শান্তি জীবনে কোন্ পথে আসবে বা আসার কোনমাত্রই সম্ভাবনা আছে কি? চরকসংহিতায় আছে পুরুষের মন আর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে যখন আত্মাতে সংরুদ্ধ হয়, তখনই নির্মল হয়। তখনই পুরুষের সত্য-শুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে, মোহ নাশ হয়। সেই মোহমুক্ত বুদ্ধি দ্বারাই সর্বভাবের স্বভাব জানা যায় এবং নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ হয়। সেই বুদ্ধিই বিদ্যা সিদ্ধি মতি মেধা ও প্রজ্ঞা বলে অভিহিত। যিনি ব্রহ্মকেই একমাত্র পর (শ্রেষ্ঠ) আর সব কিছুকেই অবর (নিকৃষ্ট) বলে বিবেচনা করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞের শান্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। তিনি তখন স্বস্থ। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ তো আত্মায় বিশ্বাস করে না।

তাদের কাছে সত্য সীমিত হয়ে আছে ইন্দ্রিয়ার্থনিষ্ঠ মন ও শরীরে। এ অবস্থায় পুরুষের (?) পূর্বোক্ত সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনাটি সুদূরপরাহত। ফলে পাশ্চাত্যজগৎ হয়েছে বহির্মুখী, বহুত্ববাদী, আত্মাবহির্ভূত ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাসী অথবা জড়বাদী। সুতরাং তাঁদের ভোগবাসনা বাতাহত অগ্নির মত বেড়েই চলবে। পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে মঙ্গল ও শান্তির পথে এখানেই রয়ে গেছে এক প্রচণ্ড বাধা। আত্মরতি না হলে শান্তি ও মঙ্গলকর্ম কখনই সম্ভব নয়। অতএব বলতে বাধা নেই নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার ঈপ্সিত মানসিক শান্তি ও সামাজিক মঙ্গল শুধু একটা দুর্লভ আদর্শমাত্র।

চরক মানুষকে দেহে মনে আহার বিহারাদিতে স্বস্থবৃত্তি পরায়ণ হতে উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমেই তিনি দেহ, মন ও আহার দ্রব্যাদির স্বভাব বা প্রকৃতি নির্ণয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। চরক বলেন, বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা আর রজতম মানুষের প্রকৃতিজ্ঞাপক। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি থেকে শরীরে রোগ উৎপন্ন হয়, তাই এই তিনটি শারীর দোষ। রজ ও তম থেকে উৎপন্ন হয় মানসিক রোগ, তাই এই দু'টির নাম মানসদোষ। তেমনি যাবতীয় আহার দ্রব্যাদির গুণ কর্ম ও প্রভাব আছে। চরক বলেন, আহারদ্রব্যাদি বাতাদি শারীর দোষের আধিক্য কিংবা সমতা সাধন করতে পারে। এই সমতা সাধনের নাম আরোগ্য আর বৈকৃতীর নাম রোগ। মানসদোষও আবার শারীরদোষকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং চরকোক্ত আহারতত্ত্বকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে দোষ ও আহারদ্রব্যাদির গুণ কর্ম প্রভাবাদির সম্যক পরিচয় একান্ত প্রয়োজন।

শা রী র দো ষ

বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা স্বাভাবিক বা অকুপিত অবস্থায় শরীর থাকতে পারে, আবার কুপিত অবস্থায়ও শরীরে থাকতে পারে, দোষভেদে তাদের কর্মও ভিন্ন। এই দোষগুলি মানুষের শরীরে হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমান—এই তিন অবস্থায় থাকে। এদের গতিও আছে।

পিত্তের প্রাকৃত-গতি দ্বারা জঠরাগ্নি পাকক্রিয়া সম্পাদন করতে সমর্থ হয়, আবার পিত্তের বৈকৃতগতি দ্বারাই মানুষের শরীরে নানাপ্রকার রোগ

জন্মে। প্রাকৃত-গতিতে শ্লেষ্মাই শরীরের বল, আবার বিকৃত গতিতে উহাই শরীরের মল। শ্লেষ্মাই শরীরের ওজোধাতু, শ্লেষ্মাই শরীরের মহাপাপ। বায়ুই কিন্তু প্রকৃত নিয়ামক। প্রাকৃত-গতিতে বায়ু দ্বারা সমুদয় চেষ্টাই নির্বাহিত হয়। বায়ুই প্রাণিগণের প্রাণ। কিন্তু বিকৃত গতিতে বায়ুই আবার বহুরোগ উৎপাদন করে, বায়ুই আবার মৃত্যু ঘটায়।

বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার স্বরূপ কি? আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাদের অর্থের সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ইউরোপীয় Humour তত্ত্বেও ইহাদের ধারণা করা যাবে না। Humour তত্ত্বে চারিটি humour-কে রস বলা হয়েছে, যথা blood, choler, phlegm এবং melancholy রস। কিন্তু বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা রস নয়। বায়ুকে wind বলাও চলে না। যেহেতু চরক বলেছেন, বায়ু অব্যয় (wind অব্যয় নহে), সমস্ত পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম, সর্বগত, ইত্যাদি। "বায়ুরেব ভগবানিতি" অর্থাৎ বায়ুই ভগবান। বরং বলা চলে wind "বায়ুর একটি প্রকাশমাত্র। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার যে সকল কর্ম—চরক তা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান দ্বারা প্রমাণ করে বিবৃত করেছেন। এই সকল কর্মের বিচার বরং এদের ধারণার খানিকটা সহায়ক হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের জীবনে এই দোষত্রয়ের শুরু হয় কখন? চরক বলেন, "গর্ভাবস্থা থেকেই কোন কোন লোকের বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থায় থাকে, কেউ কেউ বা পিত্তল বা পিত্তপ্রধান প্রকৃতি, কেউ কেউ বা শ্লেষ্মল বা শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতি হয়।"

মা ন স দো ষ

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, হর্ষ, ইত্যাদি রজ ও তম থেকে উৎপন্ন হয়। এদের বিকারেও মানুষ রোগাক্রান্ত হয়।

এই দোষগুলি অকুপিত অবস্থায় থাকলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়ে বলবর্ণ-সুখোপপন্ন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির জন্ম থেকেই দোষগুলি সাম্যাবস্থায় আছে, সে কী প্রকারে রোগাক্রান্ত হয়? চরক বলেন, দোষগুলি প্রকুপিত হলেই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। এই উভয় প্রকার দোষেরই প্রকোপকারণ হচ্ছে – অসাত্ম্যইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম।

অ সা ত্ম্য য়া র্থ স ং যো গ

আত্মাপক্ষে যাহা অসুখকর তাহা অসাত্ম্য। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থের বিষমসংযোগকে অর্থাৎ অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ, হীনযোগকে অসাত্ম্যইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ বলে।

প্র জ্ঞা প রা ধ

রজ ও তম দোষের বিকার ঘটলেই মানুষ ধী, ধৃতি, স্মৃতি বিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেই বিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যে সব অশুভ কাজ করে তাই প্রজ্ঞাপরাধ।

প রি ণা ম

কালের-পরিণামে যে সকল জরা মৃত্যু প্রভৃতি অনিমিত্তজ বিকার উপস্থিত হয় তাই পরিণাম।

আ হা র দ্র ব্য

আহার্যদ্রব্য রসভেদে ছয় প্রকার—কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল ও লবণ; গুণভেদে বিংশতি প্রকার—গুরু, লঘু; শীতল, উষ্ণ; স্নিগ্ধ, রুক্ষ; মন্দ, তীক্ষ্ণ; স্থির, সর (স্থির নহে); মৃদু, কঠিন; বিশদ, পিচ্ছিল; শ্লথ, খর; সূক্ষ্ম, স্থূল; সান্দ্র ও দ্রব।

রসভেদে ও গুণভেদে আহারদ্রব্যের প্রত্যেকটি বাতাদি দোষের নাশক বা বর্ধক হতে পারে। আহার দ্রব্যের গুণ, কর্ম ও প্রভাব বিচারের উদ্দেশ্যে চরক ইহাদিগকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করেছেন, যথা—শূকধান্য বর্গ, শমীধান্য বর্গ (ডাইল ইত্যাদি), মাংস বর্গ, শাক বর্গ, ফল বর্গ, হরিতক বর্গ, (মশলা, পেঁয়াজ ইত্যাদি), মদ্য বর্গ, জল বর্গ, দুগ্ধ বর্গ (নবনী, দধি, তক্র, ঘৃত), ইক্ষু বর্গ, কৃতান্ন বর্গ (মণ্ড, পিঠে), তৈল বর্গ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বর্গের আহারদ্রব্যের মধ্যে কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট, কোনটি নিকৃষ্ট; বা কোনটির কি কি গুণ, কর্ম ও প্রভাব—বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ আহারদ্রব্যগুলিকে বীর্যভেদে আট ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মৃদু, স্নিগ্ধ, লঘু, গুরু, উষ্ণ ও শীতল। কেউ কেউ আবার আহারদ্রব্যগুলিকে শুধুমাত্র দুই ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—উষ্ণবীর্য ও শীতবীর্য।

ক্রিয়া মাত্রই বীর্যকৃত। শরীরের সহিত অবস্থান কালে জঠরাগ্নিতে দ্রব্যসকলের পরিপাকের পূর্বে অথবা শরীরে সংযোগমাত্রই যে উষ্ণত্বাদি শক্তির অনুভূতি হয় তাই বীর্য।

রস উপযোগে ভোজনের শেষে শ্লেষ্মাদি বৃদ্ধিরূপ যে লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাকে বিপাক বলে। গুণভেদে প্রতিটি দ্রব্যেই আবার বিপাক লক্ষণের অল্পত্ব; মধ্যত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব দেখা যায়।

আহারদ্রব্যগুলির কোন কোন দ্রব্য সমষ্টিগতভাবে অবিরুদ্ধ ভোজন কিংবা সংমিলনবিরুদ্ধ ভোজনের সূচনা করে।

সংমিলনবিরুদ্ধ ভোজনে ক্লীবতা, অন্ধতা, আমবাত, বিষদোষ, অম্লপিত্ত জ্বর; পীনস, সন্তানদোষ ইত্যাদি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

অবিরুদ্ধ ভোজন

অবিরুদ্ধ ভোজনই প্রশস্ত।

আহার মাত্রা

মাত্রাহার, হীনমাত্রাহার ও অতিমাত্রাহার।

মাত্রাহার

দ্রব্য গুরুই হোক আর লঘুই হোক পরিমিত ভোজনে প্রকৃতি উপহত হয় না। মাত্রাহারই হিতজনক এবং পথ্য। আবার হিতজনকই হোক আর অহিতজনকই হোক, আহার মাত্রা, কাল, ক্রিয়া, ভূমি, দেহ, দোষ ও পুরুষের অবস্থাভেদে বিপরীত ভাবাপন্ন হতে পারে। অতএব মাত্রানুকূল, দেশানুকূল ও অভ্যাসানুকূল প্রভৃতি আহার-বিহারাদিই মাত্রাসিদ্ধ। মাত্রাসিদ্ধ আহার-বিহারাদিতে মনুষ্যশরীরে রক্ত বিশুদ্ধ হয়। রক্ত বিশুদ্ধ থাকলেই মানুষ তার অভীষ্ট বল বর্ণাদি লাভ করে, যেহেতু প্রাণ রক্তেরই অনুবর্তক। আহার আমাশয়ে প্রথম সম্পূর্ণরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় এবং পরে সেই পক্ব রস ধমনীপথ দ্বারা সমুদয় ধাত্বাশয়ে উপস্থিত হয় ও রক্তের পুষ্টি সাধন করে।

রক্তদুষ্টি ও আমদোষ

গুরুপাক, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক, বিষ্টম্ভি, বিদাহী, অপরিষ্কৃত ও বিরুদ্ধ অন্নের ভোজন, অসময়ে অন্নপান সেবন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিমান, উদ্বেগ ও ভয় দ্বারা উপতপ্ত চিত্তে যে আহার করা যায় তাহা আমদোষের প্রকোপ কারক। অতিমাত্রাহার বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মারও প্রকোপকারক। ঋতুভেদে শরৎকালের স্বভাবগুণেও রক্ত দূষিত হয়।

অগ্নির বলভেদে মানুষের প্রকাশভেদ

শরীরস্থ অগ্নির বলভেদে মানুষকে চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—তীক্ষ্ণ অগ্নিবিশিষ্ট, মন্দ অগ্নিবিশিষ্ট, সম অগ্নিবিশিষ্ট ও বিষম অগ্নিবিশিষ্ট মানুষ।

অগ্নির বলভেদে আহার প্রকরণ

সেই চারিপ্রকার মানুষের জন্য চারিপ্রকার আহার নির্দিষ্ট হয়েছে। যাদের বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা অকুপিত বা সমান তাদের পক্ষে সম অনুপ্রণিধান অর্থাৎ বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার সাম্যসংস্থাপক আহার হিতকর। যাদের কোন একটি দোষ সর্বপ্রকারে অধিক অর্থাৎ যারা বাতল, পিত্তল বা শ্লেষ্মল, তাদের দোষের আধিক্য বিবেচনা করে অগ্নির সমভাব না হওয়া পর্যন্ত সেই দোষের প্রতিকূল উপযোগী অনুপ্রণিধান অর্থাৎ আহার তাদের পক্ষে হিতকর।

শরীরের দোষবিকারভেদে আহার প্রকরণ

শরীরের দোষবিকারের সমদোষযুক্ত আহারে সেই দোষ আরও প্রকুপিত হয়। বাতল অর্থাৎ বায়ুপ্রধান প্রকৃতি যে ব্যক্তির, তার বায়ু প্রকোপক খাদ্য সেবনে বায়ু শীঘ্র প্রকুপিত হয়। কিন্তু পিত্ত বা শ্লেষ্মার প্রকোপক দ্রব্য সেবনে সেই বায়ুদোষ কুপিত হয় না। বায়ুদোষের শান্তির উপায় হচ্ছে তদুপযুক্ত ঔষধাদি ব্যবহার ছাড়াও স্নেহ এবং মধুর-অম্ল-লবণ রসযুক্ত আহার। পিত্তল বা পিত্তপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির পিত্ত প্রকোপক দ্রব্য সেবনে পিত্ত যেরূপ শীঘ্র প্রকুপিত হয়, অন্য দোষযুক্ত দ্রব্য সেবনে তা হয় না। সেই পিত্তদোষ শান্তির উপায় হচ্ছে ঘৃতপান এবং তদুপযুক্ত ঔষধ ছাড়াও মধুর-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত আর শীতল আহার। শ্লেষ্মল বা শ্লেষ্মাপ্রধান প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য।

আর শ্লেষ্মাবিকার শান্তির উপায় হচ্ছে, যথোপযুক্ত ঔষধ ছাড়াও রুক্ষগুণ বহুল আর কটু-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত আহার।

রস ও দোষ সম্পর্ক

রসগুলির মধ্যে তিন তিনটি রস এক একটি দোষের উৎপাদন করে এবং তিন তিনটি রস এক একটি দোষের উপশম করে। কটু-তিক্ত-কষায় রস বায়ুর উৎপাদন করে এবং মধুর-অম্ল-লবণ রস বায়ুর উপশম করে। আবার কটু-অম্ল-লবণ রস পিত্তদোষ উৎপাদন করে এবং মধুর-তিক্ত-কষায় রস তার উপশম করে। তেমনি মধুর-অম্ল-লবণরস শ্লেষ্মাদোষ-উৎপাদন করে এবং কটু-তিক্ত-কষায় রস তার উপশম করে।

আহার বিশেষীকরণ

একমাত্র হিতাহার-ই পুরুষের অভিবৃদ্ধির কারণ। আর অহিতাহার রোগের কারণ। কটু-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত আহার বীতল ব্যক্তির পক্ষে অহিতাহার, কিন্তু শ্লেষ্মল ব্যক্তির পক্ষে হিতাহার। যে সকল আহার শরীরের সমধাতু সকলকে (বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা) সাম্য অবস্থায় স্থাপিত রাখে এবং বিষম ধাতু সকলকে সমভাবাপন্ন করে তাদের হিতাহার আর বিপরীত হলে তাদের অহিতাহার বলে।

সু-সম খাদ্যে আহার বিচার

আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র একটা চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, আয়ুর্বেদ উন্নত সুস্থ ও দীর্ঘজীবন যাপনের প্রণালীবদ্ধ একটা বিজ্ঞানশাস্ত্রও বটে। চরকোক্ত আয়ুর্বেদ অনুসারে আমাদের গুণতঃ, দ্রব্যতঃ, কার্যতঃ ও সর্বাবয়বতঃ আহারতত্ত্বের বিষয় মাত্রাদি ভাবসহ বিচার করতে হবে; তবেই আমরা একটি সুসম খাদ্য তালিকার হদিস পাবো। আধুনিক বিজ্ঞানের মত মানুষের দেহটাকে শুধুমাত্র একটা রেলের ইঞ্জিন ভাবলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে গোটা মানুষটাকে শারীরদোষ ও মানসদোষের প্রভাবের মধ্যেই বাস করতে হয়।

নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার সুসম খাদ্য তালিকায় আহারদ্রব্যের বর্গ বিভাগ থাকলেও বর্গান্তর্গত আহারদ্রব্যগুলির গুণ, কর্ম ও প্রভাবের বিচার নেই। উপরন্তু আমাদের জগৎ যে আমাদেরই মনের সৃষ্টি—এ তত্ত্বটিও আধুনিক বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতন্ত্রে অনুপস্থিত।

ক্যা ল রি (তা প) র মা প কা ঠি তে

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (F.A.O.) শ্রমভেদে ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের একটা মানুষের দেহযন্ত্রকে কর্মে চালু রাখতে কতটা ক্যালরির (তাপের) প্রয়োজন তার একটা হিসেব দিয়েছেন। এ যেন জমিদার, ম্যানেজার,

॥ শ্রমভেদে মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরি ॥

শ্রেণী	পুরুষ : ৭০ কে জি. ওজন	স্ত্রীলোক : ৫৬ কে. জি. ওজন
স্বল্প পরিশ্রমী (Sedentary)	... ২৫০০ ক্যালরি	... ২১০০ ক্যালরি
সাধারণ পরিশ্রমী (Moderately active)	... ৩০০০ ”	... ২৫০০ ”
অতি পরিশ্রমী (Very active) ইত্যাদি	... ৪৫০০ ”	... ৩০০০ ”

কেরানী, কুলি, নারী, শিশু নামের ইঞ্জিনগুলিকে দৌড়বেগে চালাতে কোন্‌টার কত তাপের প্রয়োজন, তারই একটা হিসেব এবং সেই হিসেবেই কোন্ ইঞ্জিনটায় কত কয়লা, তেল ইত্যাদি প্রয়োজন তার-ই শ্বেতপত্র হচ্ছে নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার প্রচারিত সুসম খাদ্য তালিকা।

চরকও অবশ্য বলেছেন 'অন্তরাগ্নির স্থিতিকারণ অন্ন ও পানীয় দ্রব্যই কাষ্ঠস্বরূপ (fuel)।' কিন্তু চরক প্রাধান্য দিয়েছেন যন্ত্রীকে, যন্ত্রকে নয়। চালক চালায়. ইঞ্জিন চলে। এখানে চালকের খাদ্যের সাথে ইঞ্জিনের খাদ্যের সম্পর্ক নেই। মানুষের বেলায় তা' নয়। মানুষের চালক তার অন্তরে। সেই অন্তর পুরুষটির সাথে মানুষের খাদ্যসম্পর্ক আছে। খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার (F.A.O.) সুসম খাদ্য তালিকায় সেই 'খাদ্য সম্পর্ক' বিবেচিত হয় নি।

য ন্ত্র ভি ত্তি ক খা দ্য তা লি কা

মানুষকে তার ভুক্তদ্রব্য থেকেই উক্ত ক্যালরি বা তাপ সংগ্রহ করতে হয়। চরকও তাই বলেছেন। দেহ যন্ত্রের কল-কব্জা মজবুত ও কর্মক্ষম রাখার জন্য নানাপ্রকার ধাতুজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আর মৎস্যাদি খাদ্যও মানুষের প্রয়োজন হয়। নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা তথাকথিত সুসম খাদ্য তালিকা দিয়েছেন। চরকও

খাদ্য তালিকা দিয়েছেন, তবে এরূপ সার্বজনীন একটা তালিকা

॥ নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থা প্রচারিত দৈনিক সু-সম খাদ্য তালিকা ॥

(পুরুষ : ওজন—৭০ কে. জি.)

খাদ্যের নাম	অপেক্ষাকৃত সস্তা	অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য
	ওজন : গ্রাম	ওজন : গ্রাম
(১) ধান্যাদি খাদ্য ···	২৮৫	২৪১
(২) দুগ্ধ ···	৬১৩	৬৭০
(৩) শর্করাপ্রধান ফল, কন্দ, মূল ইত্যাদি	২২৫	১৮৩
(৪) শুঁটি কলাই, বীজ ইত্যাদি	৩০	১৭
(৫) ভিটামিন 'সি' প্রধান ফল	৯৯	১১৮
(৬) শাক সবজি	৯৯	১৯২
(৭) অন্যান্য সবজি ···	১৪৮	২৪১
(৮) মাংস, মৎস্য, মুরগীর মাংস ইত্যাদি	১১৩	১৪৮
(৯) ডিম ···	৩ দিনে ২টা—	৪ দিনে ৩টা—
(১০) চিনি ···	৪৪	৪৪
(১১) তৈল, ঘৃত, মাখন	৬৩	৬৩

নয়। খাদ্য সম্পর্কে চরক অতিস্থূল, কৃশ, মেদস্বী ও সমমাংস বিশিষ্ট মানুষের কথা যেমন পৃথক পৃথক বিবেচনা করেছেন, তেমনি অগ্নির বলভেদ এবং দোষভেদেও মানুষের পৃথক পৃথক খাদ্যোপদেশ করেছেন। নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার সুসম খাদ্য তালিকায় খাদ্যবর্গের উল্লেখেই খাদ্য বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন উক্ত তালিকাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এ একটি শরীর-যন্ত্রভিত্তিক তালিকা মাত্র।

খাদ্য বিচারে মানুষের আদর্শ মান

উপরিউক্ত খাদ্য তালিকাটি আমেরিকার ২০° সেন্টিগ্রেড গড় উষ্ণতায় বসবাসকারী ৬৯ ইঞ্চি দীর্ঘাবয়ব ২৫ বৎসর বয়স্ক ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি মানুষকে 'মান' ধরে তৈয়ার করা হয়েছে। এই 'বিশেষ' মানুষটিকেই আমেরিকা তাদের দেশের মানুষের 'আদর্শ মান' (Reference Man) বলে নির্দেশ করেছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (F.A.O.) আবার ১০° সেন্টিগ্রেড গড়

উষ্ণতায় বসবাসকারী ৬৫ কিলোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট মানুষকে আন্তর্জাতিক 'আদর্শ মান' বলে ধরেছে। ভারতবর্ষে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি মানুষের গড় উচ্চতা ও গড় ওজন বেশ খানিকটা কম এবং গড় উষ্ণতা বেশ খানিকটা বেশী হবে। কলিকাতা শহরের গড় উষ্ণতা ৩০° সেন্টিগ্রেড ধরা যায়। কলিকাতা সহরের সাধারণ পরিশ্রমী মানুষটির ২৫ বৎসর বয়সে যদি উচ্চতা ৬৬ ইঞ্চি এবং ওজন ৬৫ কিলোগ্রাম ধরা যায়, তবে ৩০° সেন্টিগ্রেড গড় উষ্ণতায় তার জন্য কমবেশী ২৬৫০ ক্যালরি বা তাপ প্রয়োজন হয়, যেহেতু উচ্চতা ও ওজন হ্রাস এবং গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট হারে ক্যালরির প্রয়োজন মাত্রা হ্রাস পাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার মানুষের 'আদর্শ মান' আমাদের দেশে খাদ্য পরিমিতি ব্যাপারে অচল। ভারতবর্ষের মানুষের আঞ্চলিক ভিত্তিতে 'আদর্শ মান' প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য যন্ত্রভিত্তিক সু-সম খাদ্যের পরিমিতি

কলিকাতার 'আদর্শমান' মানুষটিকে অবশ্য সারা পশ্চিমবঙ্গের 'আদর্শমান' মানুষরূপে বিবেচনা করা যায়। নিখিল স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংস্থার প্রচারিত সুসম তালিকা বরাবর পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৬৫০ ক্যালরি যুক্ত একটি সুসম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য প্রয়োজনের একটি সঠিক হিসাব পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভাল যে, ২৫ বৎসর বয়সের একটি মানুষের যে পরিমাণ ক্যালরির (তাপ) প্রয়োজন, ৪৫ বৎসর বয়স্ক একজনের তা অপেক্ষা ৬ শতাংশ ক্যালরি এবং ৬৫ বৎসর বয়স্ক একজনের ২১ শতাংশ ক্যালরি কম প্রয়োজন হয়।

(পশ্চিমবঙ্গের জন্য সু-সম খাদ্য তালিকা ২৪৯ পৃঃ দেখুন)

সু-সম খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পারিবারিক আয়

আমাদের প্রত্যেক পরিবারে যদি ৫ জন লোক অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী আর তিনটি সন্তান ধরা যায়, তবে সেই সংখ্যা কমপক্ষে ৪.০৫ জন পূর্ণবয়স্ক লোকের সমান হয়। ঐ পাঁচজন লোকবিশিষ্ট পরিবারে শুধু মাত্র সুসম খাদ্যের প্রয়োজনেই দৈনিক খরচ হবে উপরিউক্ত সস্তা তালিকা অনুযায়ী

পশ্চিমবঙ্গের জন্য সু-সম খাদ্য তালিকা
(দৈনিক)
পুরুষ : ওজন—৬৫ কে, জি
গড় উষ্ণতা—৩০° সেন্টিগ্রেড

খাদ্য বর্গ	খাদ্য দ্রব্য	অপেক্ষাকৃত সস্তা	অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য
(১) ধান্যাদি............	চাউল, আটা, ময়দা···	২৫২ গ্রাম	২১৩ গ্রাম
(২) দুগ্ধ................	দুগ্ধ (গরু, মহিষ···)	৫৪১ "	৫৯৮ ,,
(৩) শর্করা প্রধান ফল, কন্দ ইত্যাদি···	আলু, বীট, শালগম···	১৯৯ "	১৬৫ ,,
(৪) শুঁটি, কলাই, বীজ......	মুগ, মসুরাদি, কড়াই শুঁটি···	২৭ "	১৫ ,,
(৫) ভিটামিন সি-প্রধান ফল···	কমলালেবু, লেবু, আপেল···	৮৭ "	১০৪ ,,
(৬) শাক সবজি···	লাউ, কুমড়া, শিম, পটল, ঝিঙা···	৮৭ "	১৬৯ ,,
(৭) অন্যান্য সবজি···	ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন···	১৩১ "	২১৩ ,,
(৮) মাছ, মাংস···	রুইমাছ, পাঁঠার বা মুরগীর মাংস···	৯৯ "	১৩১ ,,
(৯) ডিম······	হাঁসের বা মুরগীর ডিম···	৩ দিনে ২টা	৪ দিনে ৩টা
(১০) চিনি···	চিনি, গুড়, মধু···	৩৯ গ্রাম	৩৯ গ্রাম
(১১) তৈলাদি···	সর্ষের তৈল, গাওয়া ঘি, মাখন···	৫৬ "	৫৬ ,,
১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে একজনের দৈনিক খাদ্যের মূল্য		১·৯৪ টাকা	২·৩৪ টাকা

৭'৮২ টাকা অর্থাৎ মাসিক ২৩৪'৬০ টাকা। তার উপর জ্বালানি; আলো, বাড়িভাড়া, লেখাপড়া ও চিকিৎসা, কাপড় চোপড় ইত্যাদির খরচ তো আছেই। পণ্ডিতেরা বলেন, এক্ষেত্রে পারিবারিক আয় হওয়া উচিত খাদ্যের জন্য ব্যয়ের তিনগুণ।

ভারতবর্ষ ও সু-সম খাদ্যতালিকা

খাদ্যবৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ভারতবর্ষকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা চলে, যথা—পূর্বভারত, দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম ভারত। প্রথম ও চতুর্থ অঞ্চলকে যদি আমিষ অঞ্চল বলা যায় তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঞ্চলকে নিরামিষ অঞ্চল বলতে হবে। নিরামিষ অঞ্চলের জন্য যে আর একটি সুসম খাদ্য তালিকা প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। নিরামিষ অঞ্চলে মাছ, মাংস ডিমের পরিবর্তে দুগ্ধই হবে প্রধান জান্তব প্রোটিন খাদ্য। প্রত্যেকটি লোককে গড়ে দশ ছটাক দুধ বণ্টন করতে গেলে দেখা যাবে আমাদের দেশের বর্তমান গো-সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। মোট কথা, সুসম খাদ্য জনসাধারণকে দিতে হলে শুধু চাউলের আর গমের ব্যবস্থা করলেই চলবে না; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্যগুলির উৎপাদন বহুগুণ বাড়াতে হবে। নতুবা 'সুসম খাদ্য' একটি আকাশ-কুসুম চিন্তায় পর্যবসিত হবে মাত্র।

সু-সম খাদ্য ও জনসাধারণ

প্রতিটি সভ্য দেশে 'সুসম খাদ্য' ব্যবস্থাকে অবশ্যকরণীয় বলে গৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশেও বিদগ্ধজন এ নিয়ে আলোচনা করেন অবশ্য। কিন্তু কার্যতঃ এসব এখনও জনসাধারণের কাছে একটা কথার কথা মাত্র। জনসাধারণের অকিঞ্চিৎকর ক্রয়ক্ষমতাই 'সুসম খাদ্য' লাভের প্রধান অন্তরায়। দেশের লোককে পুষ্টিকর সুসম খাদ্য দিতে হলে, হয় তাদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে নতুবা খাদ্য-বস্তুগুলির মুল্য হ্রাস ঘটাতে হবে।

হীনমাত্রাহারের ফল

বর্তমান অবস্থায় দেশের লোকের আহারপর্ব সমাধা হয় হীনমাত্রায়। ফলে দেশের লোকের হীনস্বাস্থ্য লাভ। চরক বলেন, হীনমাত্রআহার

বল, বর্ণ ও পুষ্টির ক্ষয়কারক, অতৃপ্তিকর, উদাবর্ত-জনক, আধুক্ষয়কারক, অবৃষ্য, ওজঃ পদার্থের পক্ষে অহিতকর, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের উপঘাতকারক, সারপদার্থের ক্ষয়কারক, শ্রীভ্রংশকারক এবং অশীতিপ্রকার বাতবিকার জনিত রোগের কারণ। জাতির এই ক্ষয়িষ্ণুতা রোধের ব্যবস্থা এখনও হয় নি।

উপসংহার

মনেরও আহার প্রয়োজন। মনের প্রয়োজন সাত্ত্বিক আহার, আর শরীরের প্রয়োজন মাত্রাদিভাবসহ হিতাহার। শরীরের ও মনের উক্ত আহারতত্ত্ব বিচারের উপরই নির্ভর করে পূর্ণাঙ্গ পুষ্টিকারক সুসম খাদ্য। একমাত্র এই পূর্ণাঙ্গ খাদ্যেই শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকারক এবং সুখ ও শান্তিপ্রদ অবস্থাটি, অর্থাৎ স্বাস্থ্য সম্ভব। অন্য পথ নেই।

পাঁচপীর-গঙ্গাদেবী-বদর বলিয়া

বুদ্ধদেব রায়

শ্রাবণের শেষ। শেষ হল ঝরঝর বাদলের দিন। এল আরেক রূপান্তরের পালা। দেখা দিল আকাশের নীল। বকের পাখার মত ছোট ছোট সাদা মেঘ হাল্‌কা হাওয়ায় আকাশে ওড়ে। ভোরের আকাশে এ কোন নতুন আলো! ধীর গতি ভরা নদী ভরা তার যৌবন- ছোট ছোট ঢেউ শুধু টল্‌মল্‌ করে। দুপারে কাশের ফুলে ভোরের সোনালী রোদ আলপনা আঁকে। ডাহুক ডাহুকী ডাকে—মিষ্টি গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে; শেফালী গন্ধ ছড়ায় ভোরের বাতাসে। এসেছে শরৎরাণী। খুশীর জোয়ারে তাই ভরা প্রাণমন।

এমনি করেই কাটে ভাদ্রের দিন একটি একটি করে। আসে ভাদ্রের সংক্রান্তি। পল্লীবাংলা হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। কানায় কানায় ভরা নদীর বুকে আনাগোনা শুরু করে ছোট বড় হালকা সরু কত না ডিঙি, রকমারি কত না নৌকো। শুরু হয় বাইচের ঘটা। এ বাইচের খেলা শুধু খেলা নয়। নদীমাতৃক পল্লীবাংলার এ এক মনমাতানো উৎসব। এর লোকাচারে নেই কোন ধর্মের বালাই। এখানে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে মিশে যায়। মনের আনন্দে তারা মেতে ওঠে বাইচের খেলায়। উৎসাহ উদ্দীপনার ঢেউ ছুঁয়ে যায় প্রতিটি মানুষের মন—নারী-পুরুষভেদে উৎসাহের কম্‌তি কিছু নেই। আশ্বিনে বাজনা বাজে দুর্গাপূজোয়। যদিও হিন্দুর উৎসব, মুসলমান গ্রামবাসীদের প্রাণেও আনন্দের রং কিছু কম নেই তাতে। শেষ হল নবমীর তিথি। আজকে বিজয়া দশমী। নদীর ঘাট লোকে লোকারণ্য। শুধু কি নিরঞ্জনের পালা? না, ভাসানের সঙ্গে সঙ্গে বাইচেরও খেলা। আজকেই তো সবচেয়ে বড় বাইচ! তাইতো আবদুলাপুর গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই এসে ভীড় করেছে ধলেশ্বরীর ঘাটে। শুধু নৌকো আর নৌকো। ধলেশ্বরীর বুক যেন তোলপাড় করে। ঐ যে, ঐ দূরে শোনা যায় গাঁয়ের মেয়েরা গাইছেন মাঙ্গলিকী—তাতে তাঁদের বরণডালা—এগিয়ে এলেন তাঁরা জলের ধারে।

আইস আইস গো পদ্মা
　　　　পান গুয়া খাও,
পান গুয়া খাইয়া পদ্মা বর দিয়া যাও।
তোমার বর পাইয়া গো পদ্মা
　　　　মাঠে ফলব সোনা,
ঝি আর পুতের হাসি দিয়া
　　　　ভরব ঘরের কোনা॥

শেষ হল মাঙ্গলিকী প্রতিযোগীদের মঙ্গল কামনা করে। উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে শুভযাত্রার সূচনা করলেন তাঁরা। বদর বদর। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইচের ছিপগুলো—আশি হাত নব্বই হাত লম্বা এক একখানা। প্রতিটিতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন ক'রে যুবক একমুখো সার দিয়ে ব'সে —সবার হাতে একটি করে বৈঠা। এইবার যাত্রা শুরু হচ্ছে। ঐতো গলুই-এর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সব। পাঁচপীর গঙ্গাদেবীর নামে দুহাতে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে গলুই-এর মুখে—

(সুরে) পাঁচপীর গঙ্গাদেবী বদর বলিয়া বেশ
　　　　গলুইতে ছিটাইয়া পানি সেলামালকি দিয়া রে—
　　　　　　　　বদর বদর—

শুরু হয়ে গেল বাইচ। ছুটে চলেছে তীরবেগে সারি-বাধা ছিপ্। মাতন নেমেছে ধলেশ্বরীর বুকে হাজার বৈঠার ঘায়ে—শব্দ উঠ্ছে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্। ও কার নৌকো? ও, দীনু মোড়লের বুঝি! সাবাস্ সাবাস্ মোড়ল! পারে পারে উৎসাহী জনতার ভীড়। উত্তেজিত কোলাহল ছড়িয়ে পড়ছে। এগিয়ে চলেছে দীনু মোড়লের ছিপ—গানের তালে তালে অবিশ্রান্ত বৈঠা চলছে—

গুন্ গুন্ গুন্ করে সোনার গাও
(মাঝিরে) কোন্ বা আশে বাইয়া যাও নাও।
নাকেরি ব্যাসর তরে থুইল্যা দিমু রে,
অবলার ঘাটে লাগাও নাও।
আমি যে অবলা নারি বইস্যা আছি ঘাটে,
দেখনা সূয্যি নামে পাটে বিকির সময় গেল কেইটে
　　　　আহা, বেশ, বেশ বেশ

ত্বরা কইরা পার কইরা দে যাব আমি হাটে
পাড়ার লোকে সবাই মোরে কলঙ্কিনী কয়
আমি ঠেকছি মানের দায়
আমার হবে কি উপায়
আহা! বেশ, বেশ, বেশ,
ননদিনী রাই বাঘিনী ননদিনী কালসাপিনী,
গাইল দিব আমায়॥

পাশাপাশি এগিয়ে এলো ও কার নৌকো? এ্যা, ফতে আলির? তাইতো! দীনু মোড়লের কেল্লা ফতে করে ফতে আলির দল এগিয়ে গেল। উল্লাসে মেতে উঠলো তাদের সমর্থকরা। সাবাস্ সাবাস্। ছুটে চলেছে ফতে আলির নৌকোখানা যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া! তর্ তর্ করে জল কেটে কেমন সুন্দর ছবির মত ছুটে চলছে! বৈঠার তালে তালে উদ্দাম গানের সুর ছড়িয়ে পড়েছে দূর দূরান্তরে—

ময়ূরপঙ্খী নাও সাধের ঝিয়ারী নাও
উড়াল দিয়া যায়
মরি হায়, হায়, হায়, হায়রে।
আমার রঙিলা নাও জল কাটিয়া যায়
মরি হায়, হায়, হায় হায়রে।
(আরে) হাইও, হাইও, হাইও
আরে জান দিয়া বাইও
ফুলঝুরি টিয়াঠুটি পাছত্ ফেলাইও॥
আজগইরা রমজাইনা মন দিয়া বা',
খোদার কুদ্রতে আইজ পঙ্খী হইছে না',
আহা বেশ, বেশ, বেশ,
আমার নায়ের দাপট দেইখ্যা
অন্যে ভিরমী খায়॥

সাবাস্ সাবাস্ ফতে আলি! চালিয়ে যাও। কিন্তু ওকি? ওটা যে—হ্যাঁ হ্যাঁ, দীনুর নৌকো। দীনুর দল মরিয়া হয়ে বৈঠা ফেলছে এগিয়ে আসছে সোঁ সোঁ করে। এইবার ওরা ছুটছে ফতে আলির পাশাপাশি। চালাও, চালাও,—প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি। আকাশ বাতাস মুখর হল পারে পারে উদ্দাম

কোলাহলে। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও এ হে হে হে, পারলে না, পারলে না। দীনু মোড়লের নৌকো যে এগিয়ে গেলো। এঃ ফতে আলির কেল্লা একেবারে ফতে করে দিলে! একেই বলে ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। বেরিয়ে গেল দীনু মোড়লের নৌকো সবার আগে পাল্লার নিশানা পেরিয়ে। সাবাস্ সাবাস্ ভাই! সাবাস্ মোড়ল! জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল উৎসাহী জনতা। দৌড়ের পাল্লা হল শেষ। ধীরে ধীরে শান্ত হল উত্তেজনা। মুখে নিয়ে জয়ের গান এইবার ফিরে চললো দীনুর দল আউটপাড়া গাঁয়ের দিকে—

চারু চন্দ্রাবলী লো,
আইজকা আমায় ফুলের মালা দে,
আইজকা আমার হাতের বাঁশী
হাতে তুইলা নে!
কংস রাজায় বধ করছি,
রাজ্যিখানা হাত করছি,
আইজকা তবে চোরা কানাই
কইবো মোরে কে?
শোনলো ওলো চন্দ্রাবলী
আইজকা আমি রাজা,
চোরা কানাই কইবি যদি
দিমু তরে সাজা।
ফুলের মালা জয়ের মালা
গলায় আইজকা পরছে কালা
উলুদিয়া চন্দ্রাবলী, তারে ঘরে নে॥

সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। সাদা সাদা তুলোট মেঘে গোধূলির রাঙা আলো। ঢেউভাঙ্গা ধলেশ্বরীর বুকে সোনার জোনাকী জ্বলে ঝিকমিক ঝিকমিক। সন্ধ্যার কুলায় ফেরে শ্রান্ত পাখীরা। সাঙ্গ হল বিষণ্ন সন্ধ্যায় দেবী দুর্গার বিসর্জন পালা। সাঙ্গ হল নৌকোর খেলা। পারে পারে ঝাপসা হল আলোকের রোশনাই। দশমীর চাঁদ ওঠে সুদূর আকাশে। আবছায়া আলো আর অন্ধকারে আউটপাড়া ঘাটে এসে লাগলো দীনু মোড়লের নাও। অপেক্ষমান জনতার মধ্যে সাড়া জেগে উঠলো, বেজে উঠলো ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া, কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি মিশে গেল এক হয়ে। একদিকে জয়ের আনন্দ অন্যদিকে

বিজয়ার শান্ত আনন্দময় এক বেদনাবোধ– সব কিছু মিলে মনে তাদের যে ভক্তির সঞ্চার হয়েছে তারই প্রকাশ ঘটলো শেষের গানে –

জয় দেলো রামের মা ত'র
গোপাল আইছে ঘরে
ধান দুব্বা বরণ কুলা দে গলুইর কপালে।

প্রতিযোগিতার এই জয়ের মধ্যেও ওরা ঈশ্বরের মহিমাকেই অনুভব করেছে। শক্ত হাতে বৈঠা তারা ঠিকই ধরেছে, কিন্তু জয়ের কৃতিত্ব যে ঐ নৌকারই। ওরই গলুই যে ভগবানের আসন। তাই ধান দুব্বো বরণডালা তো তারই প্রাপ্য—

জয় দেলো রামের মা ত'র,
গোপাল আইছে ঘরে
ধান দুব্বা বরণ কুলা
দে গলুইর কপালে।
নাইরা বাইরা ত'র সোনার
গোপাল নে লো ঘরে
জয় দেলো রামের মা ত'র
গোপাল আইছে ঘরে ॥
যেই দেবতার দয়ায় গোপাল
ফিরা আইল ঘরে
সেই দেবতা "পবন ঠাকুর"
পেন্নাম, যাই তারে ॥

ঢাকা (বিক্রমপুর) অঞ্চলের নদী ধলেশ্বরীর পারের গ্রাম আব্দুলাপুর ও আউটপাড়ার মধ্যে নৌকা-বাইচের প্রতিযোগিতা হয় ১৯৪০-৪১ সনে। নদী :–ধলেশ্বরী। ধলেশ্বরীর পারের গ্রামগুলি যথা–আব্দুলাপুর, পাইকপাড়া, ছটফটিয়া, বেতকা, আউটপাড়া, সোনারং, কুরাপাড়া ইত্যাদি থেকে জনতা এসেছিল ঐদিন নৌকাবাইচ দেখবার জন্য। প্রতিযোগিতা সুরু হয় আব্দুলাপুর থেকে আর শেষ হয় আউটপাড়ায়। দীনু মোড়লের দল আউটপাড়া, সোনারংয়ের পল্লীবাসীদের নিয়ে। আর ফতে আলির দল আব্দুলাপুর, পাইকপাড়া প্রভৃতি পল্লীবাসীদের নিয়ে গঠিত ছিল।

অতিথি

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

দীনু জানে বড়বাবু স্বপ্ন দেখছিলেন। বললো, কাকে ডাকছেন, বড়বাবু? আমি দীনু। কিছু বলছিলেন?

—দীনু? দীনু—ও-হ্যাঁ, তুই তো দীনু। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বেণীমাধবের। সে অনেকদিন আগেকার কথা। ঘোলাটে চোখ দুটো আবার স্তিমিত হয়ে এলো।

এমনি হয়। বড়মা গত হওয়ার পর যখন থেকে দীনুর ওপর দেখা-শোনার ভার পড়েছে তখন থেকেই সে লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে সব ভুল হয়ে যায় বড়বাবুর। মানুষজনের নাম পর্যন্ত সব উল্টোপাল্টা করে ফেলেন। অসুখটার পর থেকে যেন বেড়েছে। দিনের মধ্যে কতবার যে আজকাল মধু লছমন ছোটবাবুকে ডাকেন তার আর ইয়ত্তা নেই। সব খেয়াল রাখতে হয় দীনুকে, সাড়া দিতে হয়। নইলে কখন কী করে বসেন ঠিক নেই।

কী যেন বলেন আপন মনে বিড়বিড় করে। হাসেন মনে মনে। তখন চুপ করে থাকলেও চলে, কিন্তু কাউকে ডেকে যদি সাড়া না পান তাহলে মুস্কিল। দীনু যদি তখন জাগিয়ে না দেয় তবে একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সেদিন যেমন সাড়া না পেয়ে চেয়ার থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

সকাল বিকেলটা যা-ও বা একটু আধটু একা রাখা যায়, দুপুর বেলাটা খুবই সতর্ক থাকতে হয়। সন্ধ্যা বেলায় যখন কালো বাগ্দী, তিনকড়ি ঘোষ, চাটুজ্জে মশায় এরা আসে তখনও গল্প শুনতে শুনতে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েন।

দীনুকে খেয়াল রাখতে হয়। মাথাটা হেলে পড়লে তাকিয়াটা ঠিক করে দিতে হয়। মনের কথা বুঝে নিতে হয়। কারণ, অনেক সময় বড়বাবু কিছু না বলেও মনে করেন বলেছেন। উত্তর দিতে হয়, তামাকটা এগিয়ে দিতে হয়। না দিলে চটে যান। ছেলেমানুষের মত অভিমান করেন। বলা না-বলা, জাগা ঘুমোনোর কোন তফাৎ নেই বড়বাবুর।

সত্যিই নেই। বেণীমাধবের কাছে অতীত বর্তমানের সীমারেখা বিলীন হয়ে গেছে। সারাদিন মনে মনে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পরিক্রমা করেন।

বিকাল বেলাটা সব চেয়ে ভাল থাকেন। চৌধুরী বাড়ির কার্ণিশ ডিঙিয়ে যখন চাঁপা গাছটার মাথায় পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ে, সবুজ পাতাগুলি দোল খায়, স্বর্ণাভ ফুলগুলি লুকোচুরি খেলে ছোট্ট পাখীদের সঙ্গে, তখন বেণীমাধব ওর শৈশবেকে ফিরে পান। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে ওর নিজের হাতে তৈরী বাগানে ছেলেমেয়েরা যখন কুল কুড়োয়, পেয়ারা পাড়ে, কানামাছি খেলে, লাফালাফি ছুটাছুটি করে, অকারণ খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে তখন বেণীমাধবও মনে মনে খেলা করেন ওদের সঙ্গে।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জীবনসংগ্রামের পর এবার বিশ্রাম। পরিপূর্ণ-শান্তি। এযেন আবার শৈশবে ফিরে আসা।

কাজ যখন ফুরিয়ে গেল, জীবনের পাত্র ভরে উঠল অর্থ যশ প্রতিষ্ঠার সার্থকতায়, তখন ছুটি নিলেন ছেলেমেয়ে সুখী সংসারের কাছ থেকে। ঠিক তখনই মনে হল কী একটা যেন পান নি। কিসের একটা অভাবে শূন্য অর্থহীন লাগছে জীবনটা। সে কি শৈশব-কৈশোরকে ফিরে পাবার আকুতি! সুহাসিনীকে বললেন, চলো আমরা মহাগ্রামে ফিরে যাই। সুহাসিনী আপত্তি করেন নি। তিনিও যেন বৌয়েদের সংসারে স্থান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বললেন, সেই ভাল। ছেলেরা বলল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? গ্রামে গিয়ে থাকতে পারবে? তার চেয়ে টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাংলো তৈরী করে নাও। শহরের সুবিধাও পাবে, আবার গ্রামের পরিবেশও আছে।

বেণীমাধব বললেন, তোমরা ত শহরে মানুষ হয়েছো, তোমাদের জন্মভূমি এখানে। তোমরা বুঝতে পারবে না। আমার ছোটবেলার সেই গ্রাম, বন্ধুবান্ধবদের তো অন্য কোথাও খুঁজে পাব না। ভালই তো হবে ছুটিছাটায় বেড়াতে যাবে। আমরাও আসব মাঝে মাঝে।

সুহাসিনীকে নিয়ে গ্রামে চলে এলেন বেণীমাধব। যাদের জন্যে ফিরে তারা অনেকেই এখন নেই। কমল সীতানাথ মারা গেছে, রাধাই পা ভেঙে অথর্ব হয়ে পড়ে আছে। রাধাই না, গণেশ কে? কে সেদিন কুড়ুল দিয়ে নিজের পাটা কেটে ফেলল? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

এক এক সময় হঠাৎ এমনি ভুলে যান বেণীমাধব, জোট পাকিয়ে যায় চিন্তাসূত্রে। তখন অস্থির বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দীনুকে তখন প্রয়োজন হয়। জোট খুলে দেয়, ভুল ভাঙিয়ে দেয় দীনু অতীত থেকে। বর্ত্তমানে ফিরে আসার সেতু এই দীনু বাউড়ি।

দীনুকে দেখে মনে পড়ল, গণেশ ছিল কমল রেজের বাবা। সে যখন কাঠ কাটতে গিয়ে পা কেটে ফেলেছিল তখন দীনুর বয়স পাঁচ কি ছয়। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসত বেণীমাধবদের বাড়িতে। তারপর একটু বড় হয়ে ওর দাদা কালো যখন মুনিষ খাটতে গেল তখন গোরু চরানোর ভার পড়ল দীনুর ওপর।

বেণীমাধব বুঝতে পারলেন স্বপ্নের ঘোরে তিনি কালোকে ডাকছিলেন। রাধাই-এর ভাঙা পায়ের সঙ্গে গণেশ কর্মকারের কাটা পা একাকার হয়ে গিয়েছিল। বললেন, রাধাই কেমন আছে, জানিস? কাল একবার খবর নিস তো।

দীনু বলল, নেব, বড়বাবু। গেলেই হাউমাউ করে কাঁদে। আপনার কথা শুধোয়। বলে, আমাকে একবার কোলে করে নিয়ে চ' দীনু, একবার দেখে আসি, দুটো কথা বলে প্রাণটা জুড়োই।

বেণীমাধব বলেন, আহা, বড় ভালবাসে আমাকে রে। আমার ছোটবেলার বন্ধু যে। রাধাই, সীতানাথ, কমল, বিভু আর আমি একসঙ্গে কত খেলা করেছি। তদের জন্যেই তো ফিরে এলাম রে গাঁয়ে। তা দেখ, বিভু চলে গেল, সীতানাথ গেল—

বাধা দিয়ে দীনু বলল, সে কি বলছেন বড়বাবু! চাটুজ্জেমশাই তো কাল রাত্রেও এসেছিলেন।

—য়্যাঁ? চমকে উঠে বেণীমাধব বললেন। ও, হ্যাঁ। আজকাল কিরকম ভুল হয়ে যায় দেখ, বিভুটা শুনলে কি ভাববে বল্‌তো। কার কথা যেন বলছিলাম—

একই কথা বার বার শুনে শুনে দীনুর এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ভুলটা ধরিয়ে দেয়। বলে, কমল রেজের কথা বলছিলেন আজ্ঞে। তা বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন রেজ মশাই—যাওয়া একরকম ভালই হয়েছে।

বেণীমাধবের মনে পড়ল, সুহাসিনীও বড় কষ্ট পেয়েছিলেন শেষ ক'দিন। তখন বলতেন, এই যন্ত্রণা থেকে আমার মৃত্যুই ভাল। একটু বিষ যদি পেতাম। শুধু তোমার কথা মনে হয়। নইলে,—

বেণীমাধবের ঘোলাটে চোখে একবিন্দু জল জমে ছিল, সেটা মোছার চেষ্টা করলো না। এক সময় ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল।

বড় একা লেগেছিল কিছুদিন। দীনু তখন থেকে সব সময়ের জন্য কাছে রয়ে গেল। তারপর সবই সহ্য হয়ে গেছে।

তবু, হঠাৎ এক এক সময় চমকে ওঠেন। সুহাসিনীর কথা ভাবতে ভাবতে আর একজনকার কথা মনে পড়ে। সুহাসিনী আর সে যেন মিলে যায় মিশে যায় পরস্পরের মধ্যে। আবার কখনও মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে যখন সুহাসিনীর সান্নিধ্য অনুভব করেন, তখন কেন কিসের একটা অভাবের তীব্র বেদনা ঝলসে ওঠে মনের কন্দরে। সুহাসিনী কি প্রথম যৌবনে দেখা সেই মেয়েটি? কী যেন, কী যেন নাম ছিল তার? কী আশ্চর্য, কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু সে তো সুহাসিনী নয়। সে আর একজন। তাকে তো সুহাসিনীর মধ্যে খুঁজে পান না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলোটা নিয়ে আসতে গেল দীনু। এবার বামুন মেয়ে চা তৈরী করবে এক কেটলি। চাটুজ্জেমশাই, তিনু ঘোষ, সাতকড়ি মিত্তির এসে জুটবে একে একে। ফরর্ ফরর্ তামাক টানতে টানতে গল্প করবে ওরা। বেণীমাধব খোঁজ-খবর নেবেন। কিছু শুনবেন, কিছু শুনবেন না। হয়তো তন্দ্রা আসবে, স্বপ্ন দেখবেন। তবু এই আড্ডার আমেজটুকু নইলে চলবে না। কেউ না এলে ছটফট্ করবেন। দীনুকে বকাবকি করবেন।

এরি মধ্যে আবার কখন তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ মেঘের ডাকে চম্‌কে উঠলেন বেণীমাধব!

—দীনু?

সাড়া পেলেন না। আকাশের দিকে তাকালেন বেণীমাধব। কিছু বুঝতে পারলেন না। হয়তো বৃষ্টি আসবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি এলে বিভুরা হয়তো আসবে না। সমস্ত সন্ধ্যাটা তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

দীনু এসে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে বলল, চাদরটা দেব বড়বাবু। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, বিষ্টি আসবে মনে হচ্ছে।

বেণীমাধবের ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠল। বললেন, তাহলে তো তোর ভারী মজা হয় না রে? তামাক সাজতে হবে না। চা দিতে হবে না। ঢুলতে পারবি বসে বসে?

দীনু বলল, না বাবু, ঢুলবো কোথা। কী যে—

শেষ কথাগুলো প্রচণ্ড একটা ঝড়ের আবর্তে পড়ে হারিয়ে গেল। লণ্ঠনটা আড়াল করে দীনু চেঁচিয়ে উঠল, এই এসে গেল বাবু। চলুন, চলুন। ভিতরে চলুন।

বেণীমাধব কোন উত্তর দিলেন না।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালাটা এবার কাড়া-নাকাড়ার বোলে উচ্ছল হয়ে উঠল। দীনু আবার চেঁচিয়ে উঠল, শিল পড়ছে বাবু।

বেণীমাধব এবারও কোন সাড়া দিলেন না।

ঠিক এমনি একটা সন্ধ্যা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সব।

থমথমে গম্ভীর মুখে সে বলল, না, গানটান আজ ভাল লাগছে না।

বেণু বলল, কেন? কী হল? এমনি একটা ঝড়জলের সন্ধ্যা—

সে বলল, চল, আমরা কোথাও চলে যাই।

—কোথা যাবে এখন এই ঝড়জলে, মা ছাড়বে?

উত্তেজিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল। আঃ তুমি কিছু বোঝ না। জানো, মা আমার পায়ে বেড়ি দেবার চেষ্টা করছে।

বেণু বলল,—মানে, বিয়ে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাছাড়া আবার কি?

বেণু বলল, বাঃ, তাতো করবেই। বড় হয়েছ, পাশ করেছ—

ঝাঁঝিয়ে উঠল, ইয়ার্কি কোরো না। শোনো, তুমি মাকে বলো একবার।

—কী? আমি—আমি কি বলবো?

অবাক হয়ে গিয়েছিল বেণু।

—বলবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু। কিচ্ছু কি বোঝ না তুমি?

বেণু বুঝেছে তখন। বিস্ময়ে, আনন্দে, ভয়ে উত্তেজনায় ওর হৃৎপিণ্ড বোধহয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—তুমি, তুমি—বলছ। কিন্তু তোমরা যে কায়স্থ। তোমার মা-বাবা—

সে তখন পাশে এসে বসেছিল। বলেছিল, তাতে কি হয়েছে? মা-বাবা মত না দেন আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। আজকাল তো

কত হচ্ছে। বলা যায় না বাবা হয়তো মত দিতেও পারেন। এই তো দাদার বন্ধু সেদিন মল্লিকদের বাড়ি বিয়ে করল। বাবা মা সবাই তো গিয়েছিলেন সামাজিক বিয়ের দিন।

সন্ত্রস্ত বেণু বলেছিল, আমি কিন্তু বলতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত সেই বলেছিল ওর দাদাকে। দাদা কিন্তু মত দেন নি। বলেছিলেন, অশোকের সঙ্গে তুলনা করছিস, জানিস ওরা ব্রাহ্ম? ওদের সমাজে চলে। তাছাড়া অশোক ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছে। টাকায় সব মানিয়ে যায়। বেণু ক'টাকা রোজগার করতে পারবে, ভেবে দেখেছিস?

এর পর থেকে ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। সে চিঠি দিয়েছিল, বেণু জবাব দেয় নি। শেষ চিঠির দুটো লাইন এখনো মনে আছে: সাহস নেই তো এসেছিলে কেন মন নিয়ে খেলা করতে?

সুহাসিনীও একদিন এই ধরনের একটা কথা বলেছিলেন। রমেন যখন মেজ বৌমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল তখন সুহাসিনী ধমক দিয়েছিলেন রমেনকে।—বিয়ে করার সাহস যদি না থাকে তো মেয়েদের মন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলি কেন? তোর বাবা মত না দিলেও তোর বিয়ে করা উচিত। দরকার হয় দুজনে রোজগার করে সংসার চালাবি।

তা অবশ্য হয় নি। রমেন বাবার ব্যবসায়ে অপরিহার্য ছিল, আলাদা বাসা করলেও তাকে শেষ পর্যন্ত বেণীমাধবকেই নিজে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল। সেই মেয়েটির কথা তখন মনে পড়েছিল, মনে হয়েছিল, কী ক্ষতি হতো বেণু যদি ওকেই বিয়ে করতো?

বেণীমাধব চমকে উঠলেন। দীনু বলছে, কাদের একখানা গাড়ি আসছে বড়বাবু।

—গাড়ি? কাদের গাড়ি? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে—

দীনু হাঁক দিল, কোথাকার গাড়ি গো—

জবাব এল, ছোটকুটি গো। ছোটকুটি যাবো—

—তা ইদিকে কেন? রাস্তা ভুল করেছ যে—যাবে কি করে, একটা আলোও তো নেই দেখছি।

—আছে, গো আছে, মশায়। তা এই বিষ্টিতে জ্বালাই কেমনে। মাঠাকরুণরা বললে—হেট, হেট।

দীনু বেণীমাধবের অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভেতর থেকে টর্চটা নিয়ে গেল।—দাঁড়াও গো। বাঁ দিক চেপে এসো, ডাইনে নালা আছে।

ছোটকুটি। ছোটকুটি। নামটা যেন চেনা চেনা।—একবার যেন ছোটবেলায়…

গাড়িটা কাছে এসে পড়েছে। মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছে।—ও সিধু দাঁড়া বাবা, এখানেই দাঁড়া। মানুষ-জন আছে, আশ্রয় আছে। এ জানলে না ষ্টেশনেই থাকতাম।

দীনু বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইদিকে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে দাঁড়াও হে।

গাড়িটা চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে এসে উঠল।

ছোটকুটি—ছোটকুটি—কী যেন একটা ঘটেছিল। কিসের একটা বেদনাস্পন্দনময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে নামটার সঙ্গে। সে কি সুহাসিনী… না অন্য কেউ? কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়—হঠাৎ এক একটা দ্বীপের মত মাথা তোলে মনের সমুদ্রে তারপর তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। সে কি সেই না-পাওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া মেয়েটি, না সুহাসিনী যার সঙ্গে ছোটকুটির নীলের জঙ্গলে প্রথম দেখা হয়েছিল। সেই আমলকী গাছটা কি বেঁচে আছে এখনো? ভাঙা নীলকুঠি আজও গেলে দেখা যায়? ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে টুকটুকে টসটসে বঁইচির ঝাড়গুলো?

এখান থেকে পশ্চিম মুখে পদ্মবিলের বাঁপাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে সেটা ধরে মাইল আষ্টেক গেলে বেলডাঙ্গা—বেণুর মামার বাড়ি, তার পাশের গ্রাম ছোটকুটি। বঁইচি পাড়তে যাওয়া তো সেই মেয়েটির জন্যেই। কেউ সাহস করেনি, বেণু উঠে পড়েছিল ভাঙা দেওয়ালের উপর। নীচে থেকে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠেছিল—সাপ, সাপ। সাপ আছে ওখানে। নেমে এসো শীগ্‌গির। বেণু চকিত হয়ে নামতে গিয়ে পায়ে চোট খেয়েছিল। তারপর মেয়েটির বাড়ি গিয়ে চুণ হলুদ লাগাতে হয়েছিল। মামা গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সন্ধ্যার পর।

দীনু ফিরে এসেছে। বলছে, দুখানা কাপড় দিতে পারলে ভাল হয় বাবু। সব ভিজে গিয়েছে।

বেণীমাধব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।—কাপড়? কার? কি জন্যে?

দীনু বললো, ওই যে ছোটকুটির একখানা গাড়ি এলো। দুজন মাঠাকরুণ, একজন ছেলে।

—ও ছোটকুটি, ছোটকুটি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিস বটে। তা কাদের বাড়ি যাবে রে?

—আজ্ঞে তা তো জানি না, বাবু। বলছিলাম কি, মাঠাকরুণদের দুখানা শাড়ী দরকার তা—

বেণীমাধব এতক্ষণে বর্তমানে ফিরে এসেছেন। বুঝতে পেরেছেন দীনু কি বলতে চায়।—বললেন, তোর বড়মার আলমারীটা খুলবি বলছিস্। তা খোল—ও আর কী হবে বল। অতিথি সেবায় লাগুক। ছোটকুটির লোক—আমার মামার বাড়ির দেশ রে।

দীনু উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে বাবু, ওনাদের বরং ডেকে নিয়ে আসি এখানে। এই জলঝড়ের রাত—

বেণীমাধব বললেন, বেশ তো। রাজী হয় নিয়ে আয়, রাতটা এখানে থেকে যাক্। তাহলে বামুনমেয়েকে বল, রান্না চড়িয়ে দিক। এই বৃষ্টিতে অতিথিদের ছেড়ে দেওয়া—না, সে ঠিক হবে না।

—আমিও তাই বলছিলাম, বাবু। দীনু চাবিটা নিয়ে চলে গেল।

ওরা আসছে চাঁপাতলার পাশ দিয়ে।

—ও দিদা, ধরো আমাকে ভাল করে। যা পেছল, ইস্ পড়েছিলে তো এখ্‌খুনি।

ভাঙা গলায় জবাব এলো, হ্যাঁ, পড়লেই হলো। আমি কি তোদের মত পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখিনি জন্মে। বাবা বেঁচে থাকতে বছরে একবার আসতাম তো ছোটকুটি, তোরা সব আসতে দিস না তাই।

—তা নইলে পাড়াগাঁয়েই থাকতে নয় দিদা? তাহলে তোমার মুখ দর্শন করতাম না বুঝলে, ঈস্ এখানে আবার মানুষ থাকে। এই দেখো, ধরো ভাল করে।···ঠিক আছে, দিই এবার ছেড়ে—

আঃ—পিছন থেকে অন্য একটি মহিলাকণ্ঠে শোনা গেল।—কি হচ্ছে, সিধু বুড়োমানুষ, পড়ে গেলে তখন—

কোথায় গেল দীনুটা। সত্যিই তো যদি পড়ে যায়। বেণীমাধব ডাক দিলেন, দীনু, ও দীনু, আলোটা ধর্ ভাল করে।

—এই যে। দীনুর গলা শোনা গেল।—একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, দিদিমা, এই যে শান বাঁধান আছে। ব্যস—এবার আর ভয় নেই, চলে আসুন।

বোধ হয় ছেলেটির মা, দাওয়ায় উঠে এসে প্রৌঢ়াটি প্রণাম করলেন। কী উপকার যে করলেন আপনি আশ্রয় দিয়ে। পিসিমাকে নিয়ে কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম।

বেণীমাধব বললেন, এসো এসো মা। উপকার আর কি বলো। তোমরা এলে এই আমার ভাগ্য। একা মানুষ। পড়ে আছি এই দীনুটাকে নিয়ে। কেউ এলে গেলে, দুটো কথা বললে, ভাল লাগে। কেউ নেই মা, যাও, ভিতরে যাও। ও দীনু—

বৃষ্টি থামলে পর গাড়োয়ানটা গাড়ি ছাড়ার প্রস্তাব করতে সিধু হৈ হৈ করে উঠলো।—তোর ভাল লাগে তুই একা গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমরা কাল হেঁটে যাব।

বৃদ্ধা একবার মৃদু আপত্তি তুললেন, সারা রাত এঁদের জ্বালাতন করবি, দাদুভাই।

দীনু বলল, জ্বালাতন কি দিদিমা। বাবু তো লোকজন ভালবাসেন। অন্যদিন এলে দেখতেন কেটলি কেটলি চা আর তামাক চলছে। আপনাদের রান্না চেপে গিয়েছে যে, বাবু ছাড়বেন না।

সে রাত্রে বেণীমাধব স্বপ্ন দেখলেন, তিনি যেন ছোটকুটি যাচ্ছেন। সঙ্গে সুহাসিনী, মেজবৌমা আর মধু। সেই মেয়েটি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেই মেয়েটির নাম ছিল জয়া—জয়া বলেছিল একদিন ওদের বাড়ি যেতে। জয়াদের বাড়ির দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে—ও কে? একি—এযে সুহাসিনী! সুহাসিনী গাড়ি থেকে নেমে কখন ওখানে গিয়ে দাড়িয়েছে? চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন, গাড়ির মধ্যে ওর অতিথিরা—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া আর সিধু।

ঘুম ভেঙে গেল। দীনু ডাকছে।

—ওঁরা যাচ্ছেন, বাবু।

চোখ মেলে উঠে বসলেন বেণীমাধব। পূবের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে।

বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া আর সিধু। সিধু বলছে,—

—আমরা তাহলে আসি, দাদু।

এসো ভাই, আদর আপ্যায়ন করতে পারলাম না। ফেরার পথে একদিন থেকে যেও।

বেণীমাধব দাওয়ায় এলেন ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে একটি লোক দাড়িয়ে আছে। কে? লোকটি উঠে এসে প্রণাম করলো।

—আমি ছোটকুটি থেকে আসছি, জয়াপিসির ভাইপো হই সম্পর্কে। কাল রাতে ওদের যাওয়ার কথা। না পৌঁছনোয় ভয় হলো, ঝড়জলে কোন বিপদ আপদ—তা যেতে যেতে দেখি হেবোর গাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে—

জয়াপিসি, জয়া, জয়া, কে কোন্‌জন জয়া? প্রৌঢ়া না বৃদ্ধা? বেণীমাধব দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। প্রৌঢ়ার মুখ ঘোমটা ঢাকা। বৃদ্ধার বলীরেখা জর্জরিত মুখে সেই মেয়েটির কোন পরিচয় নেই। তাছাড়া সে এতো বৃদ্ধা হবে কেমন করে?

প্রৌঢ় গ্রাম্য লোকটি বলে চলেছে, তা আপনি যা উপকার করেছেন। জয়াপিসির সখ, কবে মরে যাবো, বাবার ভিটেটা একবার দেখে যাই। দেখুন দিকি কাণ্ড, এমন সময় বৃষ্টি হবে কে জানে। প্রৌঢ়া ও সিধু এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

চমকে উঠলেন বেণীমাধব—একি, একি করছেন?

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মুখ তুলে একটু হেসে বললেন, আপনি তো ব্রাহ্মণ, রায়মশায়। বয়সেও বড়, সম্মানেও বড়, দোষ কি?

গাড়োয়ানটা তাগাদা দিচ্ছে, বেলা হয়ে গেল, দিদিঠাকরুন।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

বেণীমাধবের সমগ্র সত্তা আনন্দবেদনাময় একটি অস্ফুষ্ট শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো: জয়া! হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়েটি। এই তো জয়া—পঞ্চাশ বছর পূর্বের কলকাতার সেই ঝঞ্ঝাহত সন্ধ্যা একটি গ্রামের কিশোরের বৈকালের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে যেন সেই সুদূর সন্ধ্যাটিকে ছুঁতে চাইলেন বেণীমাধব।

পারলেন না। দীনু চীৎকার করে উঠলো, বড়বাবু।

গাড়িটা তখন চলতে শুরু করেছে।
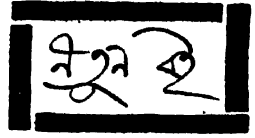
প্রাগিতিহাসের মানুষ ।। শচীন্দ্রনাথ বসু । প্রকাশক ।। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলি-১২ ।। মূল্য : ৮·০০ ।

"সৃষ্টি থেকে সভ্যতা পর্যন্ত মানুষের কাহিনী" এখনও সন্দেহাতীতভাবে গ্রথিত না হলেও পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বজ্জনেরা তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত আহৃত জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সে কাহিনী নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পাঠ্য।

কবে কোন আদিমকালে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল এই পৃথিবীর আর তার বুকে পদার্পণ ঘটেছিল প্রাণের! কিন্তু মানুষ তার পুরাকাহিনী আর বিজ্ঞানের মাধ্যমে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে চলেছে। বিশ্বের বিন্যাস আর বিধি দেখলে মনে হয় যেন কোন অভ্রান্ত গণিতজ্ঞের কারুকৃতি। অবশ্য এই গণিত-বিন্যাসের সূত্র এখনও অনাবিষ্কৃত। বিশ্বসৃষ্টি-রহস্য এখনও তর্কের আড়ালে থাকলেও পৃথিবীর বয়স মানুষ হিসেব করে ফেলেছে আর জেনে ফেলেছে প্রাণের সম্ভাব্য কারণ।

আজকের জীববিজ্ঞানীরা বলছেন যে, নিউক্লেইক অ্যাসিড-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাণের চাবিকাঠি। এই অ্যাসিড প্রাণীদেহের প্রতিকোষে রয়েছে। প্রাণের বংশকণার উপাদানও এ। আর এই বংশকণাই নির্ধারণ করে প্রাণীর আকৃতি আর প্রকৃতি।

প্রাণের আবির্ভাব থেকে শুরু হল পৃথিবীর বুকে প্রাণের মেলা। কিন্তু সদয় প্রকৃতি নির্মমও। এই প্রাণের মেলায় সে সঙ্গে সঙ্গে বাছাইও শুরু করল। ডারউইন একেই বলেছেন Survival of the fittest. এই survive করতে বা বেঁচে থাকতে গিয়ে বহু প্রাণীকে ঘটাতে হয়েছে তার বংশকণার পরিবর্তন। সেই আদিকাল থেকে আজও অবধি এই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। গতকালও যেখানে রঙ বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াত সেখানেই আজ শহর গড়ে ওঠায় তাদের আকৃতি গেছে পালটে। না পালটালে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

কালে কালে বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির বিভিন্ন যুগপর্যায়ে বহু প্রাণী আবির্ভূত হলেও প্রাকৃতিক বাছাইয়ে তারা টিকতে পারে নি। এ বাছাইটা হয়েছে শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে নয়, বুদ্ধির শক্তির ভিত্তিতে। কিন্তু যারা অবলুপ্ত হল—তারা তাদের স্বাক্ষর রেখে গেল ফসিলে।

মানুষের ইতিহাস সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একপেশে আর অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় বন্ধনে বাঁধা, তাই তার ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো সে ধরে উঠতে পারছিলো না। পশ্চিমে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের বলে দেওয়া বিধি অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তি ও গতির ধারণা ছিল সাধারণভাবে সর্বব্যাপী। তাদের মত ছিল যে নির্দিষ্ট কোন এক দিনের নির্দিষ্ট এক সময়ে পৃথিবী হঠাৎ তার সব কিছু নিয়ে চালু হয়ে গেল। অবশ্য আমাদের পুরাণে বরং আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশি মিল পাই। বৃহৎ বিষ্ণু পুরাণে ক্রমবিকাশ-বাদী মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। পশ্চিমে মানুষের এই ধারণার বিরুদ্ধে ডারুইন ক্রমবিকাশতত্ত্ব বর্তমানরূপে হাজির করেন। কিন্তু বলা চলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকেই বিভিন্ন পণ্ডিত ক্রমবিকাশতত্ত্বের বীজ-চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। এই মতবাদের বিকাশে তাঁদের নাম স্মরণীয়। কেননা তাঁরা "ডারউইনের আগে···তাঁর পথ পরিষ্কার করেছেন, অথবা ফাঁক ভরেছেন,···"। এই সারিতে আছেন সুইডেনের লিনিয়াস (১৭০৭-৭৮) ফ্রান্সের দ্য মেইয়ে (১৬৫৬-১৭৩৮), মোর্পেত্যুই (১৬৯৮-১৭৫৯), ব্যুফঁ (১৭০৭-৮৮) লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯), ক্যুভিয়ে (১৭৬৯-১৮৩২); তাছাড়া ডারুইনের পিতামহ ইরাসমাস ডারুইন (১৭৩১-১৮০২), উইলিয়াম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩৯) জেমস্ হাটন (১৭২৬-৯৭) ও চার্লস্ লায়াল (১৭৯৭-১৮৭৫) প্রমুখ এই মতবাদকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। ক্রমবিকাশবাদ প্রতিষ্ঠায় ডারুইনের সমানগৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই স্বদেশবাসী আলফ্রেড ওয়্যালেস। পরবর্তীকালে আরও অনেকেই এই মতবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এই ক্রমবিকাশতত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের জানার রাজ্যে নিঃসন্দেহে বিরাট আলোড়ন ঘটলো। কেননা ক্রমবিকাশবাদী ডারুইন বললেন নর ও বানর খুব নিকট সম্পর্কের। "শুনে সবাই প্রথমে হতভম্ব, কিন্তু দেখতে দেখতে সেই স্তব্ধতা ও আতঙ্ক কেটে গেল তীব্র

প্রতিবাদে। দেশের নেতারা এমনকি পণ্ডিতেরা পর্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন, তাঁদের অবিশ্বাস জানাতে আরম্ভ করলেন যাকে বলে 'জ্বালাময়ী ভাষায়'।" সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে সমস্ত প্রগতিশীল মতবাদের ক্ষেত্রে।

ক্রমবিকাশতত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে, কোন শুভমুহূর্তে ভগবান মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠান নি। প্রাণের বিবর্তনে মানুষের আগে নর-বানর এবং প্রায়-মানুষ প্রায়-বানর পর্যায় পার করে তবে আসতে পেরেছে পুরো মানবেরা। পণ্ডিতেরা দেখলেন আজকের 'বুদ্ধিমান মানুষেরা' আসবার আগে প্রায়-মানুষ প্রায়-বানর অস্ট্রালোপিথেকাস আর জিন্‌জানথ্রপাসরা আফ্রিকায় কোমর সিধে করে হেঁটে বেড়িয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এরা হাতিয়ার বানাতে শিখেছিল আর আহার-রুচিতে আজকের মানুষের মতো আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই চালাত। ওদিকে আফ্রিকা আর তারই প্রায় সমসাময়িক এদিকে এশিয়ার বুকে যবদ্বীপে আর চীনে পাওয়া গেল পিথেকানথ্রপাস আর সিনানথ্রপাসকে। এদের বাংলা করে বলা যায় যবদ্বীপীমানব আর চীনামানব। যদিও পর্যায়ে এরা আফ্রিকানদের স্তরেই তবু এরা আরেকটু এগিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন এরা যেমন আগুনের ব্যবহার জানত তেমনি এরা হয়তো শিখেছিল অত্যন্ত প্রাথমিক শব্দোচ্চারণ রীতি। এরা হাতিয়ার বানাতে এবং রান্না করতে শিখেছিল। তার ফলে সেই প্রাথমিক মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় বলা চলে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই ঘটে গেল। বিতর্কিত হলেও এই পর্যায়ের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পণ্ডিতেরা আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে পেয়েছেন।

এই প্রায়-মানুষ প্রায়-বানর পর্যায়ের পর যাদের পৃথিবীতে আগমন তাদের এশিয়া-আফ্রিকা নয় পাওয়া গেল সেই জার্মানির নেয়ানডার উপত্যকায়—নাম হল নেয়ানডারটাল। ("যদিও আসলে প্রথম নেয়ানডারটাল খুলি পাওয়া যায় আট বছর আগে জিব্রাল্‌টারে।") এরা কিন্তু ......"ঠিক আমাদের সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষ নয়, হয়তো মনুষ্য শাখার এক প্রশাখা, প্রকৃতির এক পরীক্ষা যা প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারল না।" য়ুরোপে এদের অনুপ্রবেশ এশিয়া থেকেই হয়ে থাকবে বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক এই মানবগোষ্ঠী ইতিহাসে তার ভূমিকা পালন করে

একদিন রহস্যজনকভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে। এর ঝোঁক ছিল শিকারের দিকে। এর অস্ত্র আগের তুলনায় কিছু উন্নত। হাতিয়ার বানাতে সে ব্যবহার করেছে পাথর এবং ভুক্ত জন্তুর হাড়। শক্তিশালী ও বৃহদাকার জন্তুজানোয়ার শিকার করতে সে যে নানারকম কৌশলের ব্যবহারও শিখেছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। নেয়ানডারটালদের···"সময়েই বোধহয় মানুষ প্রগতির পথে আরও এক পা বাড়িয়েছে দেহ আচ্ছাদন করে শীত নিবারণের উপায় শিখে ;" এরা অত্যন্ত প্রাথমিক কবর প্রথারও সূচনা করেছিল বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা মৃতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও চিন্তা করতে শুরু করেছিল বলে মনে হয় কবর দেখে। কবরের আশেপাশে কিছু উপচার তারা রাখত। তার মধ্যে কড়ি অন্যতম। "কড়ির সঙ্গে যোনির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তা ছিল উর্বরতা বা সন্তান সম্ভাবনার প্রতীক। কোনও রকম রক্ষাকবচ বা মৃতসঞ্জীবনীও তা হয়ে থাকতে পারে। অর্থ যাই হক, দূর দূরান্তর পর্যন্ত ওসব জিনিস যে তারা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছে তাতে মনে হয় বিশ্বাসটা খুব দৃঢ় ছিল।

"এই কি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষীণ সূচনা ?" কেননা ধর্মবিশ্বাসের সূচনা তো প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের দুর্বোধ্যতা থেকেই। "এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালী লেখক মন্তব্য করেছেন, "অধিকাংশ দেবতার কল্পনাই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাকৃতিক লীলার অনুভূতি হইতে।" "এবং দেশে দেশে প্রাগৈতিহাসিক দেবতারা প্রায় সবই প্রাকৃতিক দেবতা।"

মানব-ইতিহাসের সন্ধান-প্রক্রিয়ায় আজকের মানুষ কত সূত্রকেই যে ব্যবহার করছে ! বিশেষ করে পাথর আর গুহাচিত্র মানুষের অন্যতম প্রধান দুটি উপাদান। প্রাগৈতিহাসিককালের মানুষ তার জীবনে বিপ্লবের সূচনা করেছিল হাতিয়ার বানিয়ে আর আগুন জ্বালিয়ে আর তার প্রাথমিক হাতিয়ার ছিল প্রধানত পাথরের। ভারতবর্ষে যে মানুষেরা ছিল তাদের কঙ্কাল আমরা পাই নি বটে কিন্তু তাদের পাথরের হাতিয়ার আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের অস্তিত্বের। এবং এই "হাতিয়ার তুলনা করেবোঝা যায় যে মধ্য প্লাইস্টোসিনের শেষ ভাগে আফ্রিকার লোক এসে ঢুকেছিল ভারতে ;"···।

অস্ত্র দিয়ে যেমন মানুষ তার জীবনযাত্রা আর গতিবিধির প্রমাণ রেখেছে তার থেকেও বড় প্রমাণ রেখেছে সে গুহাগাত্রে তার চিন্তার চিত্রণ

করে, তার বিশ্বাসের পরিস্ফুটন ঘটিয়ে। শিকার, জননী দেবী, শিকার-নৃত্য ইত্যাদি তার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আমাদের বুঝবার জন্য সেকালের শিল্পীদল রেখে গেছে। "জন্তু জানোয়ারের তুলনায় গাছপালার ছবি খুব কম এবং প্রায়ই এত অযত্নে আঁকা যে তাদের উদ্ভিদ্ রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এই অবজ্ঞার কি এই ইঙ্গিত যে সে কালের মানুষ প্রধানত আমিষাশী ছিল?" তার থেকেও বড় কথা ছিল যে তাকে প্রতিনিয়ত প্রধানত অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হত জন্তুজানোয়ারদের বিরুদ্ধে। তাই সে "নানারকম সংকেত, চিহ্ন ও বিন্দু" রেখে গেছে, যাদের "কোনও কোনওটা অস্ত্র বা শস্ত্র, হয়তো চেনা যায় বর্শা বা বল্লম বলে,"...। গুহাচিত্রের মাধ্যমেই মানুষ প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসেরও রূপ দিয়ে গেছে। জাদুবিদ্যার সরল চেহারা এর মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়েছে। তার প্রমাণও আমরা পেয়ে থাকি জননীদেবীর মূর্তির আধিক্য দেখে। তাছাড়া "সেকালে নাকি বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীমাতার গর্ভে জন্ম নিয়ে প্রাণীরা এই সব সুড়ঙ্গ আর গহ্বরের পথে মাটির উপর উঠে আসত।" একথার পিছনে যুক্তি প্রবল হয় যখন দেখা যায় মানুষ সাঁতরেও দুর্গম গুহাভ্যন্তরে জীবন বিপন্ন করে গিয়ে ছবি আঁকছে। অবশ্যই সবকিছুর মূলে ছিল প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের মানুষী প্রচেষ্টা।

যারা এই ছবি আঁকল—তারা হল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, খাঁটি মানুষ। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এদের বলা হল হোমো সেপিয়েন্‌স্। এদের "জন্ম যে কবে তা খুব স্পষ্ট নয়; সাধারণ ধারণা এই যে নেয়ানডারটালদের অন্তিমকালে তার সৃষ্টি, কিন্তু এই ধারণারও পরিবর্তন দরকার হতে পারে।" এদের উৎপত্তিস্থল নিয়েও প্রশ্ন আছে। অনেকেই ভাবছেন, "আফ্রিকার তৃণপ্রান্তরেই কি নবমানবের উদ্ভব,..."? এই খাঁটি মানুষদের আবির্ভাব থেকেই দেখা যায় তার বিজয়-অভিযান। অনেক বৈজ্ঞানিক নেয়ানডার-টালদের রহস্যময় অবলুপ্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন সম্ভাবনাও দেখছেন যে এই খাঁটি মানুষদের সঙ্গে সংমিশ্রণই তাদের অবলুপ্তির কারণ।

যাই হোক, এই খাঁটি মানুষের আবির্ভাব থেকে যে পরিবর্তনের সূচনা হল তার গতি পূর্ববর্তী সমস্ত ধারাকে নিমিষে হারিয়ে দিল। এদের মধ্যে দেখা দিল বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আর সাংস্কৃতিক ধারা। এরা শুরু করল হাতিয়ারের উন্নতিসাধন। যে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষীণ সূচনা সম্ভাব্য বলে

প্রতিভাত হয়েছে নেযানডার্থালদের কালে তাই এই খাঁটি মানুষদের কালে বাস্তব হয়ে দেখা দিল। তাদের "পরিবার বা গোষ্ঠীর যে কর্তা তার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বাড়ল সমাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ; সে শাস্তি বিতরণ করে, সে স্বপ্নে বারে বারে দেখা দেয়, ক্রমে ভয় ও ভক্তির আকর এই প্রবীণ দলপতিই হয়তো দেবতার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল।" কেন না, "তার মন ছিল শিশুর মন"। তার ধ্যান-ধারণা ছিল অপরিণত।

এই খাঁটি মানুষদের পাথুরে হাতিয়ার-বানানোর তিন যুগ ধরেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। পুরাপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর। মধ্যপ্রস্তর যুগ এই মানুষদের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা এই সময়ই প্রথম স্থলযান স্লেজ, প্রাথমিক জলযান, প্রাথমিক পর্যায়ের ধনুর্বাণ ও সঙ্গী হিসাবে কুকুর দেখা যায় তার কাছে।

এই মধ্যপ্রস্তর পর্বের বিভিন্ন নিদর্শন ভারতবর্ষেও পাওয়া গেছে। প্রধানত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতেই এই সব নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য তার প্রাচীনত্ব এখনও নির্ণয়সাপেক্ষ।

এই যুগেই মানুষের খাদ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং খাদ্য কিছুটা সহজ-লভ্য হয়। অবশ্যই একথা বলার ভিত্তি প্রধানত য়ুরোপীয় পরিপ্রেক্ষিত। আমিষভোজী মানুষ এ সময় ফল মূলও ভোজন করতে শুরু করল। সে সময়ই সে আবিষ্কার করল যে বছরের এক একটা বিশেষ সময়ে এক একটা বিশেষ খাদ্য তার জন্য হাজির থাকে।

কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে মানুষের প্রগতি এত মন্থরগতিতে হয়েছে যাকে বলা চলে 'সময় যেন এগোতে চায় না'। এই মন্থরতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিল তার আবিষ্কার। সে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে এবং প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করবার জন্য যত প্রয়োজন বোধ করল তত হতে থাকল নিত্যনূতন আবিষ্কার। এমনি করে সে আবিষ্কার করল কৃষি আর বিভিন্ন হস্তশিল্প। এই আবিষ্কার তাকে এনে পৌঁছে দিল ইতিহাসের দরজায়। মানুষের মিছিল যখন ইতিহাসের দরজায় এসে দাঁড়াল, তখন "শুধু অন্ন চিন্তায় আর দিন কাটে না, অন্য চিন্তাও আছে, কারণ এখন তার অনেক প্রয়োজন। তা মেটাতে সৃষ্টি হয়েছে বিবিধ শ্রেণী—তাদের মধ্যে অনেকেরই সংসার আর আত্মসম্পূর্ণ নয়, চাহিদা মেটাতে নির্ভর করতে হয় অন্যের শ্রমের উপর ;…"। তাই সে বুঝতে শিখল সমষ্টিগত কর্মপদ্ধতি

আর পারস্পরিক সহযোগিতার নিতান্ত প্রয়োজন। "কিন্তু এই শিক্ষা বহু চেষ্টাতেও কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি আজও পর্যন্ত—এদিকে তার প্রয়োজন বেড়েছে বহুগুণ।"

দুশ' সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী মূল পাঠ্যাংশে শ্রীবসু মানুষের ইতিহাসের দরজায় পা দেওয়া অবধি কাহিনীকে বেশ সাবলীলভাবেই বর্ণনা করেছেন। গোটা বইটি পড়তে কখনও আড়ষ্টতার সম্মুখীন হতে হয় নি। বিজ্ঞানের বিষয়কে এমন সাহিত্য-রসসঞ্জীবিত করে পরিবেশন করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে।

তবে বইটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'একটি বক্তব্য যথেষ্ট ব্যাখ্যার সুযোগ রাখে। যেমন "মাদ্রাজ-শিল্পের সঙ্গে উত্তরের যে যোগ ছিল তা আমরা দেখেছি, হাত-কুড়াল হাতে দাক্ষিণাত্যের 'আর্য' আর চাঁছনি বা কোপানি হাতে পাঞ্জাবের 'ম্লেচ্ছ' যখন মুখোমুখি হয়েছে"…। (পৃঃ ১০৩)।

রেফারেন্সের ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্তা আরেকটু যত্নবান হলে পাঠকসমাজ বিশেষ উপকৃত হতেন। তিনি গোটা বইটিতে বহু প্রত্ন-কর্মীর নাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁদের সম্যক পরিচিতি দেন নি। বাঙালী পাঠকসমাজের কাছে তাঁদের পরিচিতি যথেষ্ট নেই একথা বিদিত। বিশেষ করে একটি উক্তির সূত্র সম্পর্কে সকলেই অনুসন্ধিৎসু হবেন। সেটি হল—"এই প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালী লেখক মন্তব্য করেছেন, "অধিকাংশ দেবতার কল্পনাই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাকৃতিক লীলার অনুভূতি হইতে"। (পৃঃ ৮৫) মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ "প্রাগিতিহাসের মানুষের" কোথাও তাঁর নামোল্লেখ নেই। প্রাসঙ্গিক পাঠ্যেও তাঁর পুস্তকটির উল্লেখ নেই।

তা সত্ত্বেও বইটি অভিনন্দনযোগ্য। কারণ বাংলা ভাষায় এজাতীয় বইয়ের প্রকাশ খুবই কম। এককালে বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি রচনা যেমন হত সে পরিমাণ তো দূরের কথা সেই জাতীয় বই খুব কমই দেখা যায়। সেক্ষেত্রে এ বইটি বিষয়-বস্তু এবং রচনাশৈলী উভয় দিকেই বিশেষ কৃতির দাবি করতে পারে। বাংলা প্রকাশনা জগতে ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বইটির আগাগোড়া বহু ছবির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়কে আরও সহজবোধ্য করে তোলা হয়েছে। ছাপা বাঁধাই বৈশিষ্ট্যের দাবি না করতে পারলেও ভালো।

—রাহুল ভট্টাচার্য।

সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ : পরিচিতি

সমর্পিত শৈশব। অরুণ ভট্টাচার্য। সাহিত্য। ১৮, পদ্মপুকুর রোড। কলকাতা ২০। দাম, তিনটাকা।

প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৭০। চার পর্যায়ে বিভক্ত কবিতাগুচ্ছ। মোট কবিতার সংখ্যা একাত্তরটি। চারটি পর্যায় যথাক্রমে : প্রেম নৈঃসঙ্গ ছবি, দরজার ওপারে, যৌবনতরঙ্গ বয়, আনন্দিত। ১৩৬৪ থেকে ১৩৭০-এর মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়েছে এই কবিতাগুলি। ব্যাক্‌-কভারে পরিচিতিতে বলা হয়েছে 'এই সর্বপ্রথম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতীকীবাদকে ফুটিয়ে তোলাই কবির অম্বিষ্ট।' রুচিসম্মত প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৭৮।

কয়েকটি কবিতা ও একটি গল্প। কুমার রায়। গ্রন্থজগৎ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম, তিনটাকা।

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৭১। পাঁচটি অংশে বিভক্ত কবিতাবলী ও একটি গল্প। যথাক্রমে : কয়েকটি কবিতা, 'স্বগত' থেকে, 'সেই কন্যাকে' থেকে, 'আজ চোখ মেলে' থেকে এবং পঞ্চম অংশে একটি গল্প আছে। মোট কবিতাসংখ্যা প্রায় তেষট্টি। তাঁর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ও নতুন রচনাগুলি থেকে সংকলিত হয়েছে এইসকল কবিতা। পরিষ্কার প্রচ্ছদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৮৪।

গার্থিয়া লরকার কবিতা। অসিত সরকার। কবিতা শাস্তি পরিষদ। ২৯, সদানন্দ রোড। কলকাতা-২৬। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। দাম, আড়াই টাকা।

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৬৪। স্পেনীয় কবি গার্থিয়া লরকার কবিতার অনুবাদ সংকলন। মোট একচল্লিশটি বিভিন্ন স্বাদের কবিতা এই সংকলনে উপস্থিত। লরকার কবিতার পূর্ণাঙ্গ একটি অনুবাদগ্রন্থ বোধ করি এই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হলো। লরকার উদ্দেশ্যে রচিত পল এলুয়ার ও নিকোলাস গিলেন-এর দুটি ছোট্ট কবিতার অনুবাদও এখানে সংকলিত

হয়েছে। ছাপা-বাঁধাই চমৎকার। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ-শোভিত এই পুস্তক-খণ্ডটির পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৬৪।

বনানীকে কবিতাগুচ্ছ। গণেশ বসু। কবিপত্র প্রকাশভবন। ৬০, সদানন্দ রোড। কলকাতা-২৬। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ। দাম, দুটাকা।

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৬৪। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩-র অন্তর্বর্তীকালে রচিত আঠাশটি কবিতার সংকলন। ছোট একটি ভূমিকায় জানা যায় 'অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত' হয়েছিলো। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট মনোহর ও উপহারযোগ্য। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০।

রবীন্দ্রনাথ। অসীম রাহা সম্পাদিত। জে. এন. ঘোষ এ্যাণ্ড সন্স। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম, দু-টাকা।

প্রথম প্রকাশ, পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত চল্লিশজন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতার সংকলন। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমেই ভূমিকায় বলা হয়েছে : 'এর উদ্দেশ্য হলো রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যকে—তাঁকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে—সাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তোলা।...সংকলনটি খুব ছোট—পূর্ণাঙ্গ তো নয়ই। কবিতাগুলিকে সাজানোর সময় শুধু এদের ভাবগত সামঞ্জস্যের দিকেই লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করেছি—ইতিহাসের ধারার দিকে নজর দিতে পারিনি।' রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত অনেক বহু প্রচারিত কবিতাই এতে স্থানপ্রাপ্ত। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৫০।

এই অন্ধকার-আলো। প্রফুল্লকুমার দত্ত। আধুনিক কবিতা প্রকাশনী। ১ মিডিল রোড। ক'লকাতা-৩২। দাম, আড়াই টাকা।

প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৬৪। স্বরচিত কবিতাগ্রন্থ। এখানে অন্তর্ভুক্ত চুয়ান্নটি কবিতার রচনাকাল উনিশশো একষট্টি-তেষট্টি। 'প্রকাশিকার কথায়' জানানো হয়েছে, 'কবিতার বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্চর্য সফলতায়, ভাববৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে এ-গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতাই উল্লেখযোগ্য।' —ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদসজ্জা প্রথানুযায়ী। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৬৪।

—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
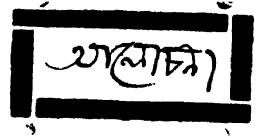
পঞ্জিকা সংস্কার ও বর্ষারম্ভ :

'চতুষ্কোণ' বৈশাখ, ১৩৭১ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা 'বর্ষারম্ভ' প্রবন্ধটি আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। পঞ্জিকাসংস্কারের মতো এমন একটি অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তিনি এ-ব্যাপারে প্রায় অনবহিত আমার মধ্যে যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছেন, তাতেই মনে হচ্ছে যে এটি সাধারণ পাঠকদের বিশেষ ভালো লাগবে। পঞ্জিকাসংস্কার বিষয়ে এটি তাঁর প্রথম লেখা নয়—এ নিয়ে আগেও তিনি লিখেছেন। তবু সরল পরিবেষণার গুণে এটি শুধু মনোগ্রাহিতা সম্পদেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, ভাবতেও সাহায্য করেছে।

পঞ্জিকাসংস্কার প্রচেষ্টায় যে সমস্ত বাঙালী গুণীদের অবদান আছে তাঁদের মধ্যে দাশগুপ্ত মশায় তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন আচার্য মেঘনাদ সাহা, পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন এবং শ্রীআশুতোষ জ্যোতিষশাস্ত্রী। এঁরা ছাড়াও আরও কয়েকটি নাম এই ব্যাপারে স্মরণীয়। আশা করি তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে বর্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে বাংলা দেশে একটি জ্যোতিষ মানমন্দির স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাণানন্দ কবিভূষণ নামক একজন পণ্ডিত এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বক্তৃতা করে সম্মিলনকে সংস্কৃত জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা ও একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুরোধ জানান। এই সভায় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে দীর্ঘকাল ধরে পঞ্জিকাসংস্কারের জন্যে তিনি চেষ্টা করে আসছেন। মানমন্দির প্রতিষ্ঠা হবার পর মাসিক দুশো টাকায় এর খরচ নির্বাহিত হবে জানতে পেরে তিনি এই টাকার দায় গ্রহণ করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লণ্ডনের রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির (রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি) সদস্য

ছিলেন। পঞ্জিকাসংস্কার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও স্মরণযোগ্য। "বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির" নামে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩২২) তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি পঞ্জিকাসংস্কার করার জন্যে মানমন্দির স্থাপনার যৌক্তিকতা দেখান এই প্রবন্ধটিতে। তিনি বলেন,

"...কেহ মনে করিবেন না যে পঞ্জিকাসংস্কার সহজে সিদ্ধ হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, পাঁজী না থাকিলে, পঞ্জিকাসংস্কার সহজে হইতে পারিত। অল্প চিন্তা ও শ্রমের দ্বারা জীর্ণ পুরাতন অট্টালিকার সংস্কার করিয়া নূতন কালোপযোগী করিতে পারা যায় না। পুরাতনের প্রতি আমাদের মায়া স্বাভাবিক; এদিকে নূতনের তাড়নাও অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না। পুরাতন ও নূতনের সঙ্গতি-সাধন অল্পদিনে হয় না। পাঁজীর সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইল যে আমাদের প্রচলিত বর্ষপরিমাণ কিছু দীর্ঘ। আমরা বর্ষ-পরিমাণ প্রত্যক্ষের তুল্য করিব, কি যেমন চলিতেছে তেমন রাখিব? যদি সত্যের প্রতি ধাবিত হই, তাহা হইলে নূতন বর্ষ ও পুরাতন বর্ষের ঐক্য থাকিবে না, পুরাতনকাল-গণনা পুরাতন মতে, নূতনকাল-গণনা নূতন মতে করিতে হইবে। বলিতে হইবে, শক ১৮৪০ অব্দের পূর্বের বৎসর গণিতে হইলে পুরাতন সিদ্ধান্তবিধি, পরের বৎসর গণিতে হইলে নূতন সিদ্ধান্তবিধি গ্রাহ্য। রক্ষা এই, চারি পাঁচশত বৎসর গত না হইলে একদিনের প্রভেদ পড়িবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর সমস্যা আছে। সেটা জ্যোতিষীগণের নিকট সায়ন ও নিরয়ন গণনা নামে খ্যাত। কথাটা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সূর্য আকাশের যেখানে আসিলে নববর্ষারম্ভ হইত, এখন সেখানে হয় না, প্রায় ২২ অংশ (ডিগ্রি) পশ্চাতে হইতেছে। আজিকালি সবাই জানে, ইংরেজি ২১ মার্চ দিবারাত্রি সমান হয়। এই সমান দিবারাত্রির দিন প্রকৃত বর্ষারম্ভ। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সেই দিনই বর্ষারম্ভ হইত। কেন এখন হয় না, সে কথার প্রয়োজন নাই। যদি সত্য ধরেন, প্রাচীন বিধি মানেন, [তাহা] হইলে এক বৎসর হইতে প্রায় ২২ দিন কাটিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতে হয়। সে বৎসর প্রচলিত মতে যে দিন ৮ই চৈত্র, নূতন মতে ১লা বৈশাখ ধরিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র থাকিবে না,

উত্তরভাদ্রপদ প্রথম হইবে ; মেষ প্রথম রাশি থাকিবে না, মীন প্রথম হইবে ; বৈশাখ প্রথম মাস থাকিবে না, চৈত্র প্রথম হইবে। যদি সত্য না ধরেন, যদি লোক-ব্যবহারই প্রধান মনে করেন, তাহা হইলে কিন্তু নববর্ষদিন প্রভৃতি সব নাম কৃত্রিম হইবে। এখন আমরা কৃত্রিম নামেই চলিতেছি; বলিতেছি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুইমাস গ্রীষ্মকাল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চৈত্র বৈশাখ দুইমাস গ্রীষ্মকাল বলা কর্তব্য। এইরূপ পরিবর্তন যে নূতন, তাহাও নহে। অনেকে সংস্কৃত পুস্তকে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু দেখিয়া থাকিবেন। পূর্বকালে. বেদের কাল হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নক্ষত্র-গণনা, মাস-গণনা, মাসের সহিত ঋতুগণনার পরিবর্তন অনেকবার হইয়াছিল। লোক প্রথম প্রথম প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যকে স্বীকার করে। সমাজ পুরাতন হইলে, তাহাতে বহু বিধি প্রথা কিছুকাল চলিত হইলে, পুরাতন যাহা অসত্য দাঁড়ায়, তাহার সহিত নূতন যাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়, এই দুই-এর সঙ্গতিসাধন কঠিন হইয়া উঠে ; যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক বলিয়া লোকে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এই কারণেই, যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক, মানিতে গিয়া এখন আমরা প্রকৃত নববর্ষারম্ভ বহু দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছি।"

দাশগুপ্ত মশায় বাংলাদেশের প্রগতিশীল জনগণের কাছে সংস্কৃত নব পঞ্জিকা চালাবার জন্যে সচেষ্ট হতে যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে এ-প্রসঙ্গের শেষ করছি।

—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মাইকেলের তিনটি নিরুদ্দিষ্ট কবিতার সন্ধানে

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণায় পূর্বসূরী তথা পথিকৃৎদের কাজকর্ম সম্পর্কে তাচ্ছিল্য এবং তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বেশ কিছুকাল থেকেই এদেশে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, কোন কিছু "নতুন আবিষ্কারের" বেলাতেও আমরা তাঁদের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ কাজকর্ম ধীর স্থির চিত্তে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বোধ করি না, এটা সত্যি বেদনাদায়ক। বন্ধুবর চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত 'প্রবন্ধ পত্রিকা'-র ১৯৬৩ সালের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র 'মাইকেলের তিনটি নিরুদ্দিষ্ট কবিতা'

আবিষ্কার করতে গিয়ে এই ধরনের ঘটনার আর একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবেন, এ আমরা আশা করি নি।

শ্রী মৈত্রের আবিষ্কার খুবই সাধারণ : মাইকেল বাল্যকালে 'লিটারারী গ্লীনারে' ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখেছিলেন (শ্রীমৈত্রের মতে 'পাঁচটি')। মাইকেলের জীবনীকারদ্বয় অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং নগেন্দ্রনাথ সোম, তার মধ্যে মাত্র দুটিকে মাইকেলের লেখা বলে 'চিনতে' পেরেছেন, কারণ নিচে M. S. D. লেখা রয়েছে ; বাকি তিনটি তাঁরা মাইকেলের লেখা বলে বুঝতেই পারেননি, কারণ দুটির নিচে স্বাক্ষর রয়েছে D-- T এবং একটিতে লেখা রয়েছে by a Young Hindu! কবিতা তিনটি কী? (১) Stanzas to...... (২) Sonnet to Futurity (৩) Sonnet —by a young Hindu.—এই হ'ল আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের কাহিনী পাঠকদের শোনাবার জন্য শ্রী মৈত্র পত্রিকাটির পুরো দশ পৃষ্ঠা বহু ইংরেজী-বাংলা উদ্ধৃতি, চিঠিপত্র, টীকাটিপ্পনী এবং গ্রন্থপঞ্জী দিয়ে সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন।

প্রথম দর্শনে মনে হবে কী বিপুল পরিশ্রমই না করতে হয়েছে শ্রীমৈত্রকে এই গবেষণায়! আর তা ছাড়া, লেখক যে নিপুণ গবেষক, 'গবেষণা-পত্রের' সাজসজ্জা দেখে সেবিষয়ে পাঠকদের কোন সন্দেহই থাকবে না। কেবলমাত্র মাইকেলের সেই দুই বেচারা অক্ষম জীবনীকারদ্বয়ের (যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ) বৃহৎ গ্রন্থ দুটি সশ্রদ্ধচিত্তে যাঁদের পড়া আছে তাঁরাই বুঝবেন উক্ত গবেষণা-পত্রের চমক-দেওয়া অধিকাংশ উক্তি ও তথ্য ঐ অক্ষম জীবনীকারদ্বয়েরই সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় সংগৃহীত!

(১) এবারে আসা যাক আসল কথায়। 'লিটারারী গ্লীনারে' প্রকাশিত মাইকেলের সব কবিতাগুলি যোগীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথ চিনতে পারেননি, কেবলমাত্র যেগুলিতে M. S. D. রয়েছে সেগুলিই বুঝতে পেরেছেন, এতথ্য শ্রীমৈত্র পেলেন কোথায়? উক্ত জীবনীকারদ্বয় কেবল ক'টি 'নিরুদ্দিষ্ট কবিতা' সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন না, মহাকবির পূর্ণ জীবনী সংকলনে প্রাণপাত করেছেন, একথা সাধারণ পড়ুয়ামাত্রেরই জানা আছে। পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করতে গিয়ে মাইকেলের বাল্যকালের রচনার কয়েকটি নিদর্শনই মাত্র তাঁরা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কাজেই 'চিনতে কষ্ট হয়নি' কথা ওঠে না। যাঁরা অতো বিপুল তথ্য, বন্ধুবান্ধবের

পত্র, সমসাময়িক কাগজপত্র থেকে নজির কষ্ট করে আহরণ করতে পেরেছিলেন, আর একটু কষ্ট করলে শ্রীমৈত্রের 'নিরুদ্দিষ্ট' কবিতাগুলি সংগ্রহ করে মৈত্রমহাশয়ের 'কষ্ট'ও তাঁরা লাঘব করতে পারতেন, এবিশ্বাস ঐ দুই সুধীজনের ওপর আমাদের থাকা উচিত।

(২) হিন্দু কলেজে পড়াকালীন মাইকেল যে-সব পত্রপত্রিকায় ইংরেজী কবিতা লিখেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীমৈত্র লিখেছেন, "এ ছাড়া হিন্দুকলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত পত্রিকায় মধুসূদন লিখেছিলেন বলে ভোলানাথ চন্দ উল্লেখ করেছেন। রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নি। মধুসূদনের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বাল্য রচনার আদিতম নিদর্শন আনাবিষ্কৃত থেকে গেল।" (পৃঃ ১৯) খুবই আশ্চর্যের কথা বলতে হবে! ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস'-এ 'জ্ঞানোদয়' সম্পর্কে লেখা শেষ করে নিচে যে নির্দেশনামা দিয়েছেন তাতে মনে হয় রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে 'জ্ঞানোদয়'-এর ১ম থেকে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত কপি আছে! তবে শ্রীমৈত্র উক্ত পত্রিকার ফাইলটি কষ্ট ঘাঁটলেও মাইকেলের ঐ বয়সের ইংরেজী কবিতাগুলি এখনকার মতোই অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। কারণ রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত হলেও 'জ্ঞানোদয়' ছিল বাংলা পত্রিকা এবং তাতে "নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী" স্থান পেত। "ভোলানাথ চন্দ" (?) উল্লিখিত "রামচন্দ্র মিত্র" নাম দেখে এমন সহজ সিদ্ধান্ত না করে শ্রীমৈত্র যে গ্রন্থের নাম ৩৪ বার উল্লেখ করেছেন, সেই যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" যদি তিনি ধৈর্য ধরে আগাগোড়া পড়তেন তাহলে জানতে পারতেন "হিন্দু কলেজের শিক্ষক, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এসময়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। মধুসূদনের কোন সহাধ্যায়ী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, সংবাদ ইত্যাদি লিখিতেন। মধুসূদন তাহা অবগত হইয়া, জ্ঞানান্বেষণে লিখিতে আরম্ভ করিলেন" (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯০৫, পৃঃ ৫৪)। 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮৩১ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া শুরু করলেও দু-বছর পর থেকে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হতে থাকে, এতথ্য দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাইকেল এতেই লিখতেন। তবে হ্যাঁ, এর ফাইল বোধ হয় বিদেশে দু-এক কপি থাকলেও

এদেশে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ-সব ঘটনা দেখে মনে হয় শ্রীমৈত্র নিষ্ঠাবান গবেষকের চেয়ে সহজ সাংবাদিকতার আশ্রয়ই বেশী করে বেছে নিয়েছেন।

(৩) তারপর আসছে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, "তৃতীয় যে কবিতাটি আমরা মধুসূদনের বলে সিদ্ধান্ত করেছি সেটি হোল—Sonnet—by a Young Hindu. প্রথমত তাঁর যে কবিতাটি M. S. D. স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা ছিল 'By a young native Student.' এখানেও প্রায় অনুরূপ শিরোনামা রয়েছে—এ-ছাড়া আরও একটি প্রমাণ রয়েছে—কবিতাটির তলায় রয়েছে Kidderpore 1842. খিদিরপুরে তিনজন কবির বাস। দুইজন হলেন রঙ্গলাল ও তস্য ভ্রাতা গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা মধুসূদনের বাল্যবন্ধু; এঁদের কেউ ইংরেজীতে কোন কবিতা লিখেছেন বলে শোনা যায়নি। খিদিরপুরে আর একজন কবির জন্ম; তিনি অবশ্য ইংরেজীতে কবিতা লিখতেন। তাঁর Shair and other Poems ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি হলেন সুবিখ্যাত কাশীপ্রসাদ ঘোষ। ইত্যাদি‥ …কাজেই খিদিরপুরের ঠিকানাবিশিষ্ট কবি এই সময়ে অন্য কেউ হতে পারেন না।" (পৃঃ ২১) এই কবিতাটি যে মধুসূদনের তা সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে শ্রীমৈত্র আরও অনেক যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেছেন, সেগুলি আর নাইবা উল্লেখ করলাম। মোট কথা আমরা বুঝতে পারছি যে একটি কবিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে শ্রীমৈত্রকে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে শিবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকবি রঙ্গলাল', নগেন্দ্র সোমের 'মধুস্মৃতি', ঘাঁটাঘাটি করতে হয়েছে Literary Gleaner 1842-43, Calcutta Monthly Journal 1821-23, এবং আরও অনেক কিছু! কিন্তু যা তিনি একেবারেই করেননি বলে মনে হচ্ছে, তা হ'ল, খুবই সহজলভ্য যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' আদ্যোপান্ত পাঠ, অথচ গ্রন্থটির ৩।৪ বার উল্লেখ তিনি করেছেন পাদটীকায়। উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করলে তাঁর এই পণ্ডশ্রম হত না; কারণ যোগীন্দ্রবাবু শ্রীমৈত্রের আবিষ্কারের অপেক্ষায় না থেকে বহু বৎসর পূর্বেই ওটি পত্রস্থ করে গেছেন। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৯০৫) ১০৯ পৃষ্ঠায় আছে: "কেবল পত্রে নয়, কবিতাতেও তিনি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের Literary Gleaner পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন;—

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be ;
* * * * *
There let me live and there let me die."

(পূর্ণাঙ্গ পাঠ)

তবে হ্যাঁ, শ্রীমৈত্রের পাঠ-এর সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন :

১ম লাইন : শ্রীমৈত্র : Off, like a sad imprisoned bird, I sigh— যোগীন্দ্রনাথ : Oft like a sad bird I sigh

৭ম লাইন : শ্রীমৈত্র : Makes ev'n the lowliest happy ; where the eye যোগীন্দ্রনাথ : Makes e'en the lowest happy ; where the eye

শেষ লাইন : শ্রীমৈত্র : There let me live, and there oh ! let me die যোগীন্দ্রনাথ : There let me live and there let me die.

এছাড়া যতিচিহ্নে দুটো পাঠে পার্থক্য আছে। শ্রীমৈত্র সামান্য তিনটি কবিতা উদ্ধার করতে গিয়ে যে পরিমাণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাতে মূল পত্রিকার ফাইল না দেখলে তাঁর পাঠ অকৃত্রিম বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়।

(৪) এবারে ধরা যাক্ বাকি দুটো কবিতা : Stanzas to··· এবং Sonnet to Futurity. শ্রীমৈত্র সিদ্ধান্তে এসেছেন কবিতা দুটি মধুসূদন দত্তের ; কারণ নিচে লেখা রয়েছে D—T (অর্থাৎ 'দত্ত')। আর দত্ত পদবীধারী লেখক তখন মাত্র তিনজনই ছিলেন : (ক) বঙ্কুবিহারী দত্ত : তিনি B.B.D. স্বাক্ষর করতেন এবং পদ্য লিখতেন না। (খ) গুরুচরণ দত্ত ; তিনি অবশ্যি কবিতা লিখতেন, তবে স্বাক্ষর করতেন G.C.D. (গ) আর রইলেন মধুসূদন দত্ত। কাজেই ও দুটো কবিতা মধুসূদনের না হয়েই যায় না !

কবিতা দুটো মধুসূদনের হ'ক তাতে আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু শ্রীমৈত্র যে-পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে সন্দেহ ও আপত্তির যথেষ্ট অবকাশ থাকছে। প্রথমত, সেই সময়ে দত্ত পদবীধারী

'লেখক' তিনি মাত্র তিনজন পেলেন কোথা থেকে! আমাদের সন্ধানে এমন একটি দত্ত পরিবার রয়েছে, যার পাঁচজন সভ্যই সেই সময়ে কবিতা লিখতেন। এঁরা হলেন: Rajnarain, Hurchunder, Omeshchunder, ও Sosheechunder. এঁদের ইংরেজী কবিতার একটি সংকলন ১৮৭০ সালে Dutt Family Album নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদের কেউ যে D—T স্বাক্ষর করে শ্রীমৈত্রের আবিষ্কৃত কবিতা দুটি লেখেন নি এমন প্রমাণ শ্রীমৈত্র আমাদের দিতে পারেন নি। দিতে পারলে গবেষণা পূর্ণাঙ্গ হ'ত।

দ্বিতীয়ত, শ্রীমৈত্র একজনের নাম করেছেন 'গুরুচরণ দত্ত', যিনি নাকি G.C.D. স্বাক্ষরে কবিতা লিখতেন। ইনি কে, শ্রীমৈত্রের কাছে আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়। কারণ মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পাঠ করলে 'গুরুচরণ দত্ত' নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় 'গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত' ("মধুসূদনের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরলোকগতা, কুমারী তরুদত্তের পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মধুসূদনের ন্যায় ইনিও বহুভাষায় সুপণ্ডিতও ছিলেন এবং কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট কবিতা-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যের লিখিত অনেক কবিতা সৌন্দর্য্যে ও মৌলিকতায় মধুসূদনের বাল্যের কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।...আজীবন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেবা করাতে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কোনও উপকার সাধিত হয় নাই।" (পৃঃ ১০৪, যোগীন্দ্রনাথ বসু: মা. ম. জী. চ)। এই গোবিন্দচন্দ্র যে পূর্বোক্ত 'পঞ্চ দত্ত'র মধ্যম দত্ত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৫) সর্বশেষে কিছু ছোটখাটো ত্রুটির কথা আলোচনা করা যাক। সাধারণ সংবাদপত্রের নিবন্ধ হলে এগুলি হয়তো উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু গবেষণাপত্রে তাচ্ছিল্য করা যায় না। শ্রীমৈত্র লিখেছেন: খিদিরপুরে তিনজন কবির বাদ। দুইজন হলেন রঙ্গলাল ও তস্য ভ্রাতা গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা মধুসূদনের বাল্যবন্ধু; এঁদের কেউ ইংরেজীতে কোন কবিতা লিখেছেন বলে শোনা যায় নি" (পৃঃ ২১)।

কেবলমাত্র "শোনা কথার" ওপর শ্রীমৈত্র নির্ভর না করলেই পারতেন, বিশেষ করে রঙ্গলাল যখন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে একজন সুপণ্ডিত

ব্যক্তি ছিলেন। রিচার্ডসনের "ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট" এবং "ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারি"-তে রঙ্গলালের অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, পূর্বসূরী পণ্ডিতেরা তার সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। আর তা ছাড়া ১৮৭৩ সালে "মুখার্জীস্ ম্যাগাজিনে" অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা যিনি তর্জমা করেছিলেন, বাল্যকালে তিনি এক-আধটা মৌলিক কবিতা লেখেন নি, এমন রায় দেওয়ার মতো অনুসন্ধান রঙ্গলাল সম্পর্কে হয় নি বললেই চলে।

তারপর শ্রীমৈত্র লিখেছেন, "রঙ্গলাল ও তস্য ভ্রাতা গণেশচন্দ্র" নাকি মধুসূদনের 'বাল্যবন্ধু' ছিলেন! কেন, যেহেতু এঁদের সবার ঠিকানা খিদিরপুরেই পাওয়া যাচ্ছে? বোধহয় শ্রীমৈত্রের ধারণা ঠিক নয়। কারণ, রঙ্গলাল যখন মাতার মৃত্যুর পরে হুগলী কলেজে পড়া সাঙ্গ করে খিদিরপুরে মাতুল রামকমলের গৃহে বাস করতে আসেন তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর (১৮৪৩), ইতিমধ্যে তাঁর বিয়েও হয়ে গেছে। আর সেই ১৮৪৩ সালের গোড়াতেই ১৯ বছর বয়সে বিয়ে এড়াবার জন্য মধুসূদন খিদিরপুরের পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় নেন এবং ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এরপরে স্থায়ীভাবে তিনি খিদিরপুরে ফেরেন বহু পরে, ১৮৫৫ সালে। কাজেই "রঙ্গলাল ও তস্য ভ্রাতার" সঙ্গে মধুসূদনের 'বাল্যবন্ধুত্বের' কোন সুযোগই হয় নি।

মাইকেলসুহৃদ্ ভোলানাথ চন্দ্র এবং কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ বারংবার শ্রীমৈত্রের নিবন্ধে ভোলানাথ চন্দ ও কালীপ্রসাদ ঘোষ রূপে উল্লিখিত হলেও এ-দুটি ত্রুটি মুদ্রাকরপ্রমাদ বলে গ্রহণ করতে আমরা রাজী আছি।

—অরুণকুমার রায়